দারসে কুরআন সিরিজ-৩

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-০৩

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক

খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির

খন্দকার প্রকাশনী

পাঠকবন্ধু মার্কেট

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ মে - ১৯৯২

পনের তম প্রকাশ ঃ জুলাই - ২০১০

প্রচ্ছদ

আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ

আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস

৩৬, শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

www.pathagar.com

প্রারম্ভিক কথা

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে এ সিরিজের তৃতীয় সংস্করণের সঙ্গে 'জিহাদ' ও 'যুদ্ধ' সম্পর্কে আল-কুরআনে মোট যতগুলি আয়াত নাযিল হয়েছে তার ২০টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও ৬৫টি আয়াত নম্বর ও সূরার নামসহ্ এর শেষ অধ্যায় সংযুক্ত করা হলো–যা আল-কুরআন থেকে দেখে নেয়া যাবে।

আল-কুরআনে যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮৫স্থানে নামাযের নির্দেশ রয়েছে ঠিক তেমন-ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐ ৮৫ স্থানেই 'যুদ্ধ' ও 'জিহাদ' সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে। নামাযের শুরু করতে হয় যেমন 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর সহকারে ঠিক তেমনি জিহাদও যুদ্ধ শুরু করতে হয় 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর সহকারে। নামাযও যেমন ফরয তেমনি যুদ্ধ ও জিহাদকে আল্লাহ্ ফরয করেছেন।

এছাড়াও সুরা আন-নিসার ৯৫ নম্বর আয়াতে ৩ স্থানে এবং সূরা মুহাম্মদের ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–'যারা জিহাদ করে তাদের মর্যাদা যারা জিহাদ করে না তাদের মর্যাদার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি।'

এক একস্থানে বলা হয়েছে–'যারা জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা কখনোই মুজাহিদদের সমতুল্য হতে পারে না।'

দারসে কুরআনের এ সিরিজে 'দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা'-সহ্ ইসলামী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে জিহাদ ও যুদ্ধের গুরুত্ব কি পরিমাণ সেটাও সাধ্যানুযায়ী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কুরআন থেকেই দেখানো হয়েছে যে আল্লাহ্ কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছেন।

আশা করি এর থেকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের কারো মনে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর হবে এবং ২৩ বছর ধরে কুরআনের বিভিন্ন সূরা নাযিলের সঙ্গে যুদ্ধ ও জিহাদের সম্পর্কটা কি তা-ও আমরা বুঝতে সক্ষম হবো।

ইতি–

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

সূচীক্রম

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভ	০৫
নাযিল হওয়ার সময়কাল	০৬
কয়েকটি শব্দার্থ	০৬
জিহাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা	০৬
সৃষ্টির সর্বত্রই জিহাদ	০৭
ইসলামী জিহাদ কি	০৮
৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা	০৯
দ্বীনে হকের তালিকায় রদবদল করলে যা ঘটে	১১
দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব পালনে অসততার কারণে যা ঘটতে পারে তার কয়েকটি নমুনা	১৪
বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দ্বীনে হক 'জ্বি হুজুর'-এর ভুমিকায়	১৭
ইসলাম বিজয়ী থাকলে কি লাভ হতো	১৮
জিহাদের নির্দেশ	১৯
দ্বীন প্রতিষ্ঠার হুকুম ও হুকুম পালনের ধারা	২৩
ছক তৈরি সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথাঃ	৩০
ছক এঁকে দেখানোর উদ্দেশ্য	৩১
দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী কর্মধারা (ছক)	৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদ	৪০
অন্যান্য ৬৫টি আয়াত	৪৮

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى
الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ
عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ
ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ - الصف ١٣-٩

অর্থ ঃ তিনি (সেই আল্লাহ) যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত লাভের গ্রন্থ এবং সঠিক জীবন ব্যবস্থা সহকারে যেন তিনি তা বিজয়ী করে দেন আর যতসব বাতিল জীবন ব্যবস্থা আছে তার উপর।

যদিও তা মুশরিকরা পছন্দ করবে না। হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলবো কি যা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক

আজাব থেকে নাজাত দেবে? তা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে (জিহাদে) লিপ্ত হয়ে যাওয়া। এটাই উত্তম ব্যবসা যদি তোমরা বুঝ। এতে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করবেন এবং এমন বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত হচ্ছে এবং যা বেহেশ্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান। আর এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য লাভজনক ব্যবসা। এছাড়াও পাবে দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস যা তোমরা ভালোবাসো তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আশু বিজয়। আপনি মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন। (আস-সাফ ঃ ৯-১৩)

www.pathagar.com

নাযিল হওয়ার সময়কাল

উল্লেখিত আয়াতকয়টির পূর্বে অর্থাৎ সূরা সাফের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—'মুশরিকদের পক্ষে যতই অসহ্য এবং তাদের যতই গাত্রদাহ হোক না কেন, আল্লাহ তার দ্বীনে হককে অন্যান্য বাতিল দ্বীনের উপর জয়ী করবেনই।'

১০ থেকে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে—'ঈমানদার লোক যারা সত্যিকার অর্থে ঈমানদার—তারা যদি সত্যিই পরকালের জীবনের সফলতা চায় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে লড়তে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে দেয়ার উদ্দেশ্যে যারা জান-মাল দিয়ে লড়বে তাদেরকেই পরকালে স্থায়ী বসবাসের জন্য পবিত্র বাসস্থান আল্লাহ দান করবেন।'

কয়েকটি শব্দার্থ

هُوَ – তিনি। اَلَّذِىْ – যিনি। اَرْسَلَ – পাঠিয়েছেন। رَسُوْلَهٗ - তাঁর রাসূলকে। بِ – সহ। اَلْهُدٰى – হেদায়েত। دِيْنٌ – জীবন ব্যবস্থা। دِيْنِ الْحَقِّ সঠিক জীবন ব্যবস্থা। لِ -জন্যে। يُظْهِرَ -বিজয়ী করেন। ٗه -তাকে। عَلَى -উপরে। الدِّيْنِ -দ্বীনের। كُلِّهٖ -সবগুলো। اَوْ - যদিও। كَرِهَ -অসহ্য মনে করে বা অপছন্দ করে। اَلْمُشْرِكُوْنَ -মুশরিকগণ। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ -ওহে যারা। اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছে। هَلْ -কি। اَدُلُّكُمْ -বলব তোমাদের تِجَارَةٍ -ব্যবসায়। تُنْجِيْكُمْ -মুক্তি দিবে তোমাদেরকে। فَوْزٌ -লাভ, সাফল্য।

'জিহাদ' (جِهَادْ) শব্দের শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা

আরবী جُهْدٌ শব্দ থেকে جِهَادْ। এর অর্থ চরম প্রচেষ্টা। আরবীতে 'চেষ্টা' বুঝানোর জন্য দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. جَدٌّ (জাদ্দ) বা সাধারণ চেষ্টা।

২. جُهْد (জুহুদ) বা চরম প্রচেষ্টা।

www.pathagar.com

যে চেষ্টায় ফেল করলে মানুষের চোখে পানি আসে না, সেই ধরনের চেষ্টা বুঝানোর জন্য جِدّ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন দুই ব্যক্তি পাশাপাশি সাইকেল চালাতে গিয়ে উভয়ই চেষ্টা করলো একে অন্যকে পিছনে ফেলতে, এতে যে ফেল করে সে রাস্তায় বসে কাঁদে না। এ চেষ্টা جَدّ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

আর যদি কারো ছেলেকে বাঘে ধরে নিয়ে যায় তাহলে তার পিতা সে বাঘের হাত থেকে ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য যে চেষ্টা করে সেই চেষ্টায় ফেল করলে অবশ্যই পিতা শোকে ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে কাঁদে। এই ধরনের চেষ্টা বুঝানোর জন্য جُهْد শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর এই ধরনের চেষ্টা যখন দ্বিমুখী হয় তখন ঐ দ্বিমুখী চেষ্টা বুঝানোর জন্য جِهَادْ (জিহাদ) শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন একটা ছেলেকে বাঘে ধরলে বাঘের চরম চেষ্টা হবে ঐ ছেলেকে আহার করা, আর ছেলের পিতার চরম চেষ্টা হবে ঐ ছেলেকে বাঘের হাত থেকে উদ্ধার করা। এই যে বাঘের ও ছেলের পিতার মধ্যে দ্বিমুখী বা বিপরীতমুখী চরম প্রচেষ্টা তার-ই নামই 'জিহাদ'।

সৃষ্টির সর্বত্রই জিহাদ

লক্ষ্য করলে জ্ঞানে ধরা পড়বে যে, এ সৃষ্টির যেখানেই যা কিছু টিকে আছে তা জিহাদ করেই টিকে আছে। দেখুন পৃথিবীর সবকিছুরই একটা বিপরীতমুখী শক্তি আছে। এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, সবকিছুরই জোড়া আছে, সে জোড়াটা হচ্ছে বিপরীতমুখী। যেমন গরমের বিপরীত ঠাণ্ডা, আলোর বিপরীত অন্ধকার, ভালোর বিপরীত মন্দ, শিক্ষার বিপরীত অশিক্ষা, উপরের বিপরীত নিচু। এভাবে যেটার দিকেই লক্ষ্য করা যাবে দেখা যাবে তাঁর বিপরীত একটা কিছু আছেই। আর সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা জিনিস দেখা যাবে, তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে একটা হয় বিনা চেষ্টায়–যেটাকে আমরা প্রাকৃতিক বা Natural বলতে পারি, আর তার বিপরীতটা হয় চেষ্টা-সাধনায়। তাই সেটাকে আমরা কৃত্রিম বা Artificial বলতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা সত্য জ্ঞানে ধরা পড়বে যে, যেটারই মূল্য আছে এবং প্রয়োজন আছে সেটার জন্যই চেষ্টার প্রয়োজন আছে। আর

www.pathagar.com

যেটাই তার বিপরীত সেটার জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তা আপন থেকেই হয়। যেমন বাঁচা ও মরা, এর মধ্যে বাঁচার জন্য চেষ্টা লাগে কিন্তু তার বিপরীত মরার জন্য কোনো চেষ্টা লাগে না। লাগে শুধু বাঁচার জন্য চেষ্টা করা। ঠিক তেমনই শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে শিক্ষার জন্য চেষ্টা লাগে কিন্তু অশিক্ষার জন্য চেষ্টা লাগে না। বরং শিক্ষার জন্য চেষ্টা না করলে এমনিতেই অশিক্ষা হয়ে পড়ে। উন্নতি ও অবনতির মধ্যে উন্নতির জন্য চেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু অবনতির জন্য কোনো চেষ্টা লাগে না।

আবার দেখুন, একটা প্লেনকে উপরে টিকে থাকার ও চলার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন, কিন্তু নিচে নামার জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই। প্লেন উপরে ওঠে তার নিজস্ব চেষ্টায়, আর নিচে নামে প্রাকৃতিক শক্তি মধ্যাকর্ষণের টানে। আবার দেখুন একটা গাছের পাতা যখন বোটা থেকে ছিড়ে ফেলবেন তখন সে আর টিকে থাকবে না, শুকিয়ে যাবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে গাছের সঙ্গে লেগে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত গাছের জীবনী শক্তি তাকে শুকিয়ে ফেলতে দেবে না। এভাবে বিপরীত শক্তির সঙ্গে মুকাবিলা বা চরম শক্তি প্রয়োগ করে টিকে থাকার নামই 'জিহাদ'। বলুন এ জিহাদ কোথায় নেই। বরং বলতে হবে, যা-ই টিকে আছে তা জিহাদ করেই টিকে আছে।

ঠিক তেমনিভাবেই ইসলামকে সত্যিকারভাবে জিন্দা ইসলাম হিসেবে টিকে থাকতে হলে তাকে জিহাদ করেই টিকে থাকতে হবে। এ জিহাদকে হতে হবে সার্বক্ষণিক। যেমন উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় প্লেনের ইঞ্জিনের চেষ্টায় কোনো বিরতি দিলে সেই মুহূর্তেই প্লেনকে মধ্যাকর্ষণশক্তি টেনে মাটিতে নামিয়ে ফেলবে। ঠিক তেমনি মুসলমান যে মুহূর্তেই ইসলামের সার্বক্ষণিক জিহাদ বন্ধ করবে সেই মুহূর্তেই তার বিপরীত শক্তি ইসলামকে টেনে নামাবে জাহেলিয়াতের অন্ধকারের মধ্যে।

বাঁচার চেষ্টা বাদ দিলে যেমন মরণ অনিবার্য ঠিক তেমনি জিহাদ ত্যাগ করলেও জাহেলিয়াত অনিবার্য। বাঁচার চেষ্টা যেমন কোনো দোষণীয় কাজ নয় তেমনি ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য জিহাদও কোনো দোষণীয় কাজ নয়। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে 'জিহাদ' অর্থ 'যুদ্ধ' নয়, জিহাদ অর্থ 'চরম প্রচেষ্টা'।

ইসলামী জিহাদ কি

'ইসলাম' অর্থ 'শান্তি'। এ শান্তি মানব জীবনে আসে তখনই যখন মানুষ প্রত্যেকেই যার যার ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারে। আর এ

www.pathagar.com

অধিকার থেকে যখনই একশ্রেণী অন্য শ্রেণীকে বঞ্চিত করে তখনই বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে আর শান্তি থাকতে পারে না। আর যারা কোনো উপায়ে একবার শান্তির মালিক হয়ে পড়ে তারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করে নিজেরা বেশি বেশি সেই শান্তি ভোগ করে। এটাই হচ্ছে পরকালে অবিশ্বাসীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইসলাম তা সমর্থন করে না। ইসলাম চায় যার যার অধিকার সে সে ভোগ করবে, কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং একে অন্যের উপর প্রভু হয়ে চেপে বসবে না।

কিন্তু বললেই তো আর কেউ তা শোনে না। যারা অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ একবার পেয়ে বসেছে তারা চরম চেষ্টা করে সেই সুযোগ হাতছাড়া না হওয়ার জন্য। আর পরকালে বিশ্বাসীরা চরম চেষ্টা করে অবৈধ সুযোগভোগীদের নিকট থেকে জুলুমের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে জনগণকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের মৌলিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দিতে। এ কারণেই আল্লাহ বিশ্বাসীদের সঙ্গে অবিশ্বাসী জালিম শ্রেণীর হয় এক অনিবার্য দ্বন্দ্ব। এর নামই জিহাদ যার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে।

৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা

এখানে আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাঁর রাসূলকে পথ ও পন্থা এবং সঠিক জীবনব্যবস্থা সহকারে পাঠিয়েছেন যেন সেই সঠিক জীবনব্যবস্থাকে অন্যান্য সকল ধরনের জীবনব্যবস্থার উপর গালিব বা জয়ী করে দিতে পারেন। এখানে হেদায়েতের পথ বুঝানোর জন্য 'আল-হুদা' এবং সঠিক জীবনব্যবস্থা বুঝানোর জন্য 'দ্বীনিল হক' বলা হয়েছে।

'সঠিক জীবনব্যবস্থা' বলতে বুঝায় এমন এক জীবনব্যবস্থা যা মানব জীবনের সাথে খাপ খায়। যেমন ধরুন একটা গরুকে যদি কাপড় পরানো হয় তাহলে মানুষ তা দেখে হোঃ হোঃ করে হাসবে, কারণ কাপড় পরা গরুর জীবনের সাথে খাপ খায় না। তেমনি মানব জীবনের সাথে উলঙ্গপনাও খাপ খায় না।

আবার দেখুন কাপড় পরা তো মানব জীবনের সাথে খাপ খায় ঠিকই কিন্তু তার মধ্যেও খাপ্পা-বেখাপ্পা আছে। একজন পুরুষ লোক একটা লুঙ্গি পরে যেকোনো মানুষের সামনে যেতে পারে, কিন্তু একজন মহিলা তা পরে কারো সামনেই যেতে পারে না। সুতরাং কাপড় পরার নিয়মের মধ্যেও যে

www.pathagar.com

নিয়মটা সভ্য মানব জীবনের সাথে খাপ খায় সেই নিয়মটাই দ্বীনে হকের তালিকাভুক্ত। আর যে নিয়মটাই সভ্য মানব জীবনের জন্য বেমানান তা ইসলাম সমর্থন করে না।

ঠিক তেমনি সামগ্রিক জীবন যাপনের বেলায় যা-ই সভ্য মানব জীবনের সঙ্গে খাপ খায় তার সবকিছু মিলেই হচ্ছে 'দ্বীনে হক' এবং তা-ই আছে দ্বীনে হকের তালিকার মধ্যে। সেই তালিকাটা রয়েছে যে গ্রন্থের মধ্যে তাকেই বলা হয়েছে 'আল-হুদা', আর তারই অন্য নাম 'আল-কুরআন'।

আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের নিখুঁত তালিকার মধ্যে রদবদলের কোনো অধিকার আল্লাহ কোনো মানুষকে দেননি। যেমন ডাক্তারের দেয়া প্রেসক্রিপশনের মধ্যে রদবদল করার কোনো অধিকার কোনো রোগীরও নেই এবং কোনো কম্পাউন্ডারেরও নেই।

ডাক্তারের দেয়া ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে সামান্যতম রদবদল করলেও যেমন তা আর ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র থাকে না ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করলে তা-ও আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা থাকে না।

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ না দিয়ে কোনো কম্পাউন্ডার যদি কিছু রদবদল করে ওষুধ দিয়ে রোগী মেরে ফেলে তবে তাকে জনগণ যে নজরে দেখে ঠিক সেই একই নজরে দেখতেন আল্লাহর নবী-রাসূলগণ তাদেরকে যারা আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার মধ্যে রদবদল করে সমাজেও চরম অশান্তির সৃষ্টি করতো এবং জনগণের পরকালের জীবনকেও করে দিতো বরবাদ। এই কারণেই প্রত্যেক নবী-রাসূলের সমকালীন সমাজপতিদের সঙ্গে নবী-রাসূলগণের হয়েছে চরম সংঘর্ষ ও সংঘাত।

একজন কম্পাউন্ডার ডাক্তারের দেয়া ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী ওষুধ না দিয়ে একটা রোগীকে দুনিয়ার জীবনে মাত্র একবারই মারতে পারে, কিন্তু আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থাপনার মধ্যে রদবদল করলে গোটা সমাজের সমস্ত মানুষই পরপারের অনন্তকালের জীবনটাকেই জাহান্নামের ইন্ধন করে দিতে পারে। সুতরাং আল্লাহর দেয়া দ্বীনে হকের পরিবর্তনকে আল্লাহর নবীগণ আদৌ ছোট করে দেখেননি। দেখেছেন খুবই বড় করে ও গুরুত্ব সহকারে। সুতরাং যারাই আল্লাহর দেয়া দ্বীনে হকের মধ্যে কোনো পরিবর্তন এনেছে আল্লাহর নবীগণ তাদের কাউকেই ক্ষমা করেননি। এটাই ইতিহাসের প্রমাণিত শিক্ষা।

www.pathagar.com

দ্বীনে হকের তালিকায় রদবদল করলে যা ঘটে

দ্বীনে হকের তালিকার মধ্যে নাই সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, অশ্লীল সিনেমা বেপর্দা, জোর-জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার-ইত্যাদি যাবতীয় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ।

লক্ষ্য করুন, উপরে দ্বীনে হকের তালিকাবহির্ভুত মাত্র যে কয়টার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা আমাদের সমাজে থাকায় কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে এবং লক্ষ্য করুন, এসব কি সভ্য মানব জীবনের সাথে খাপ খায়?

আসুন পৃথক পৃথকভাবে কিছুটা খতিয়ে দেখি যে এর কোনটায় কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে।

অশ্লীল সিনেমা

বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে ৫ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ যুবক-যুবতী সিনেমা দেখে থাকে। এই সিনেমায় আর যা-ই হোক, কমপক্ষে তিনটি জিনিস তো শিখছেই। যথা ঃ

১. বিয়ের পুর্বে প্রেম-ভালোবাসা।

২. অভিনয়, অর্থাৎ বাস্তবে যে যা নয় তা কিছুক্ষণের জন্য সাজা। যেমন যে স্বামী নয় সে কিছুক্ষণের জন্য স্বামী সাজলো। আর যে স্ত্রী নয় সে কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রী সাজলো। আমাদের সমাজের যুবক-যুবতীরা এসব অভিনয় দেখে বাস্তব জীবনে কি তার অভিনয় করছে না?

৩. বিশেষ ধরনের রুচিবোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে সিনেমার অন্য একটি প্রধান শিক্ষা। যেমন আমাদের এ সমাজে মেয়েদের বিশ বছর পূর্বেও জামা-কাপড় সম্পর্কে যে রুচিবোধ ছিল আজ তা নেই। বিশ বছর পূর্বে একটা মেয়ে যে ধরনের জামা পরে নিজের পেটের সন্তানের সামনে যেতেও লজ্জাবোধ করতো এখন তা পরে হাটে-মাঠে-ঘাটে সর্বত্রই বেড়াতে পারে। এই যে রুচিবোধ পাল্টে গেছে এটা কি সমাজের জন্য কম মারাত্মক এবং কম ক্ষতিকর? আর এটা হয়েছে সিনেমায় প্রদর্শিত পোশাকের প্রভাবে।

জুয়া

'জুয়া' হচ্ছে আধুনিককালের এক বৈজ্ঞানিক পন্থার চুরি। যে পন্থায় মানুষ নিজের পকেটের টাকা নিজ হাতেই অন্যের হাতে তুলে দিয়ে চুপচাপ খালি হাতে বাড়ি ফিরে আসে। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে পারে না। এমনকি পুলিশকেও না। এই বৈজ্ঞানিক পন্থার আধুনিক চুরির নামই হচ্ছে 'জুয়া'। এটা কি সমাজের জন্য কম ক্ষতিকর?

www.pathagar.com

মদ

'মদ' হচ্ছে এমন জিনিস যা পান করলে কিছুক্ষণের জন্য তার কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আর সেই সময়ে সে এমন কিছু করতে পারে যা হিতাহিত জ্ঞান থাকলে করতো না। বাংলাদেশে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের কারণে যে অসংখ্য লোক মরছে তারও মূলে ঐ 'মদ'।

মদখোর লোকেরা তাদের মায়ের সাথেও এমন ভাষায় কথা বলে যা জ্ঞান থাকা অবস্থায় স্ত্রীকেও কেউ বলে না। ফলে মদখোর লোকের আচরণ ও বন্য পশুদের আচরণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এজন্যই আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের তালিকায় বা দ্বীনে হকের মধ্যে মদ পান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুদ

'সুদ' এমন এক ব্যবস্থা যা একশ্রেণীর লোককে করে পথের ভিখারী আর একশ্রেণীর লোককে করে আকাশছোঁয়া ধনী। আর এর বিপরীত হচ্ছে 'যাকাত'।। সুদ ও যাকাতের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক ঠিক সেই একই ধরনের সম্পর্ক হচ্ছে দিন ও রাতের মধ্যে। দিনের বেলা সূর্য উঠলে যেমন রাত আর টিকতে পারে না ঠিক তেমনিই যাকাত চালু হলে সুদ আর ঠিকতে পারে না। এর একটা উদাহরণ নিন।

মনে করুন সমাজের প্রায় শতকরা ৯৯.৯০ জন লোক গরীব আর .১০ জনই হচ্ছে কোটিপতি ধনী। ধরুন অভাবের সময় ঐ গরীব শ্রেণী প্রত্যেকেই এসে ধনীর দ্বারে ধরনা দিয়ে বললো–'আমাদের সাহায্য করুন নইলে জীবন আর বাঁচে না।'

এবার ধনী তাদেরকে দুই নিয়মে সাহায্য করতে পারেন। যথা ঃ

১. হয়তো বলতে পারেন যে, এখন প্রত্যেককে একশত টাকা করে কর্জ দিবো, কিন্তু আমাকে বছরে শতকরা বিশ টাকা হারে সুদ দিতে হবে।

উক্ত পরিস্থিতিতে অনাহারী গরীবেরা এরচেয়ে কঠিন কোনো শর্ত লাগালেও আপাততঃ জীবন বাঁচানোর জন্য এই শর্তে অবশ্যই কর্জ নিবে।

২. অন্যদিকে ঐ ধনী ব্যক্তি যিনি ধরে নিন এক কোটি টাকার মালিক তিনি যদি তাঁর যাকাতের আড়াই লক্ষ টাকা ঐ গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেন যাতে প্রত্যেকেই একশত টাকা নয়, বরং তারচেয়েও বেশি করে পেতে পারতো তাহলে কি তারা সুদে কর্জ নিবে?

www.pathagar.com

তা অবশ্যই নিবে না। ফলে যাকাত চালু হলে গরীবরা অর্থ পাবে, কিন্তু তা আর ফেরত দেয়া লাগবে না। যার ফলে তারাও সমাজের এক একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে পরিণত হতে পারবে।

এছাড়াও সুদ ও যাকাতের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, সুদের অর্থ নিচ থেকে উপরে ওঠে, আর যাকাতের অর্থ উপর থেকে নিচে নামে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে উপর থেকে নিচে নামা। যদি কখনো নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তবে নিশ্চয়ই তাতে কোনো অঘটন ঘটে যাওয়ার ভয় থাকে। যেমন প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে উপর থেকে পানি নিচে বর্ষণ হওয়া। আর তার মধ্যেই থাকে মানবকূলসহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও গাছপালার জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমত, যা ছাড়া পৃথিবীর কিছুই টিকতে পারে না।

কিন্তু যখন সেই পানিই নিচ থেকে উপরে ওঠে, অর্থাৎ যদি প্লাবন হয় তবে তা হয় মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীর এবং বহু গাছপালারও মৃত্যুর কারণ। ঠিক তদ্রূপ মানুষের শরীরের রক্ত যদি সকল স্থান থেকে একযোগে উপরের দিকে ধাওয়া করে এবং মাথায় গিয়ে জমা হয় তবে তা হয় ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ। কিন্তু যদি ঐ রক্ত নিয়ম অনুযায়ী শরীরের সর্বত্র ছড়াতে থাকে তবে তা হয় সেই ব্যক্তির সবল ও সুস্থ থাকার একটা প্রধান কারণ।

ঠিক তদ্রূপই প্রকৃতির নিয়ম বা খোদায়ী বিধান অনুযায়ী যদি উপর তলার লোকদের নিকট থেকে যাকাতের অর্থ নিচের দিকে এসে ছড়িয়ে সকল গরীবের নিকট পৌঁছে যায় তবে তা হয় একটা সমাজকে সহজ ও সুস্থভাবে পরম শান্তির সঙ্গে টিকে থাকার অন্যতম কারণ। এজন্যই দ্বীনে হকের তালিকায় 'সুদ' নেই বরং আছে তার বিপরীত 'যাকাতব্যবস্থা'।

ঘুষ

ঘুষের দ্বারা মানুষ একের অধিকার অন্যে ভোগ করে, অযোগ্য লোক ক্ষমতায় আসে, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চিত করা হয়, হকদারের হক নষ্ট করা হয়। অপরাধী খালাস পায়, নিরপরাধী শাস্তি পায়, অপরাধীরা প্রশ্রয় পায়, ভালো মানুষগুলো অসহায় হয়ে পড়ে, দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। এভাবে হাজারো অপকর্মের জন্ম দেয় এই 'ঘুষ'। এ জন্য ঘুষ যে দেয় ও যে নেয় তারা উভয়ই সমান দোষী। তারা উভয়ই জাহান্নামী। দ্বীনে হকের তালিকায় এ ঘুষের স্থান নেই।

এভাবে যেটাই সুষ্ঠু মানব জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না সেটাই দ্বীনে হকের তালিকায় নেই। আর যেটাই সুষ্ঠু মানব জীবনের সঙ্গে খাপ খায় ও

www.pathagar.com

মানব জীবনের জন্য প্রয়োজন সেটাই আছে দ্বীনে হকের তালিকায়।

অসততা

অসততার জন্য যা যা ঘটে তার বিস্তারিত তালিকা দিতে গেলে তো তাতেই একটা বড় বই হয়ে যাবে। সুতরাং বিস্তারিত তালিকা না দিয়ে কিছু কিছু অসততার নমুনা এখানে হাজির করছি যার থেকে এইটা অনুমান করা সহজ হবে যে, দায়িত্বশীলদের মধ্যে যদি অসততা ঢুকতে পারে তবে তা একটা রাষ্ট্রের বা একটা সমাজের জন্য কত মারাত্মক ক্ষতির কারণ করতে পারে।

দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব পালনে অসততার কারণে যা ঘটতে পারে তার কয়েকটি নমুনা

১. বড় বড় কলকারখানার যারা দায়িত্বশীল তারা যদি ফাঁকি দিয়ে মাত্র ৫০০ টাকার মবিল বাঁচানোর চেষ্টা করে তবে তাতে হয়তো ৫ লাখ টাকার একটা শ্যাফ্‌ট্‌ ভেঙ্গে যেতে পারে যাতে সরকারের বা মালিকের যাবে ৫ লাখ টাকা, ফলে কর্মচারীরা হয়তো মাসখানেক বসে থাকবে। বন্ধ হবে হয়তো ১০/১৫ হাজার শ্রমিকের কাজ। এক মাসে তারা একেক জনে দেনা হবে এক হাজার/দেড় হাজার করে টাকা।

এ ধরনের ক্ষতি দায়িত্বশীলদের সামান্য লোভের জন্যও হতে পারে কিংবা দায়িত্বহীনতা বা বেখেয়াল কিংবা অসতর্কতার জন্যও হতে পারে। সুতরাং দায়িত্বহীনতা, বেখেয়ালী ও অসতর্কতা এর কোনোটাকেই দ্বীনে হকের তালিকার মধ্যে স্থান দেয়া হয়নি। এ কারণেই ইসলামে ঈমানশূন্য লোকদের জন্য কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদ নেই।

২. ইন্‌কাম ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে যারা দায়িত্বশীল তাদের মধ্যে যদি সততা না থাকে তাহলে বড় বড় কোটিপতিদের নিকট থেকে যেখানে মোটা অংকের টাকা সরকারের ফান্ডে আসতে পারতো সেখান থেকে একটা পয়সাও না আসার কারণ হতে পারে। সবচেয়ে বড় ধনীর সম্পূর্ণ কর ফাঁকি দেয়া, মিথ্যা রিপোর্টকে সমর্থন করে সরকারের লাখ লাখ টাকা ক্ষতি তারা করে দিতে পারেন। এ কারণেই ইসলামে অসৎ লোকের কোনো চাকরি নেই।

৩. একজন পাটকলের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা যার উপর পাট ক্রয়ের ও গুদামজাত করার দায়িত্ব থাকে তিনি অসৎ হলে হয়তো কাগজে-কলমে

www.pathagar.com

দেখালেন যে, গুদামে ১৫০ টাকা মন দরে ১ লাখ মণ পাট কিনে রাখা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে হয়তো রাখা হয়েছে ৮০ হাজার মণ। যার মূল্য হয়ত ১ কোটি বিশ লাখ টাকা। কিন্তু দেখানো হলো যে, পাট রাখা হয়েছে দেড় কোটি টাকার।

অতঃপর অসৎ কর্মকর্তা কিছু কর্মচারীর সহযোগিতায় হয়তো গোটা গুদামে আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পাট নষ্ট করে দিতে পারে এবং এভাবে দেখাতে পারে যে, বিশ হাজার মণ পাট পুড়ে গেছে। এর ফলে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ৩০ লাখ টাকা কিছু অসৎ লোককে সঙ্গে নিয়ে লুটেপুটে খেতে পারে, কিন্তু এতে কোম্পানীর ক্ষতি হয়ে যায় দেড় কোটি টাকা। আর তা কি কোম্পানী লস্ করবে? তা করবে না। সে পরবর্তী বছরে পাট কিনবে ১৫০ টাকার স্থলে ১০০ টাকা দরে। ফলে তার খেসারত দিতে হবে গরীব চাষীদের। এ কারণেই অসৎ লোকের কোনো চাকরি দ্বীনে হকের ব্যবস্থাপনার মধ্যে নেই।

৪. যারা ঠিকাদারী নিয়ে স্কুল বিল্ডিং তৈরি করে তাদের মধ্যে অসৎ লোক থাকলে টাকা মারার জন্য যদি সিমেন্ট কম দেয় তবে ঐ বিল্ডিং ঝড়ে ধসে পড়বে এবং তার মধ্যে যারা আশ্রয় নিবে তাদের মাথার উপর ঘরের ছাদ বা দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে তারা মারা যাবে।

যারা রাস্তার ঠিকাদারী নিয়ে কাজ করে তারা অসৎ হলে ২ বছর পরে আর তাদের তৈরি রাস্তায় গাড়ি চলা তো দূরের কথা, হেঁটে চলাও মুশকিল হয়ে পড়ে।

এ ধরনের কত যে ক্ষতি করতে পারে অসৎ লোকে তার কোনো তালিকা করাই মুশকিল। তবে এভাবে যদি চিন্তা করা যায় আর হিসাব করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে একটা রাষ্ট্রকে অসৎ লোকেরা একেবারে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত করে দিতে পারে।

অপব্যয়কারীকে ইসলামে 'শয়তানের ভাই' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অপব্যয়ে যা ব্যয় হয় তা যদি গরীবদের বিতরণ করা হতো তাহলে বাংলাদেশে একটা লোকও আর গরীব থাকতো না। এ অপব্যয়ে কিভাবে কত টাকা ক্ষতি হয় তা তারাই ভালো জানেন যারা অপব্যয় করে থাকেন। আমরা পুরা হিসাব না দিতে পারলেও কিছুটা কাছাকাছি হিসাব দিতে পারবো সন্দেহ নেই। যেমন ঢাকা শহরে রাতের বেলা বের হলেই মাঝে মাঝে চোখে পড়ে নানা ধরনের রঙ-বেরঙের আলো দিয়ে বাড়ি

www.pathagar.com

সাজানো হয়েছে, গেট করা হয়েছে এবং আরো অনেক কিছুই করা হয়। এতে কি খরচ কম হয়?

আবার দেখি রাস্তার পাশের কোনো কোনো এলাকায় গাছের গোড়ার দিকে প্রায় ৩ হাত পর্যন্ত চুন দিয়ে সাদা করে রাখা হয়। এটা দেখে নেতাদের একটু চোখ জুড়ায় মাত্র, কিন্তু এতে কি জনগণের কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে? তা অবশ্যই পারে না।

এছাড়া আপনি বায়তুল মুকাররমের দোকানপাটগুলো ঘুরে দেখুন, এমন বহু দোকানই চোখে পড়বে যেসব দোকান থেকে কিছু কিনলে তার দাম তারা সাধারণ দোকানের চেয়ে দ্বিগুণ/তিনগুণ বেশি নিবে। ফলে সেখান থেকে যা কিছুই কিনবেন সেটাতেই হবে অপব্যয়।

আপনি একজন সাধারণ লোক ঢাকা থেকে ট্রেনে করে চট্টগ্রাম যান। সেখানে যাওয়া-আসা, দুই দিন থাকা ও হোটেলে খাওয়া সবমিলে আপনি ৫০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে আরাম করে বেড়িয়ে আসতে পারবেন। কিন্তু এমনও লোক আছে যার এতটুকু বেড়াতে কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে।

মানুষ যদি সত্যিই দ্বীনে হকের তালিকাবহির্ভূত কোনো অকাজে অর্থ ব্যয় না করতো আর সেই টাকা দিয়ে যদি গরীবদের পুনর্বাসিত করা হতো তাহলে বাংলাদেশের একটি আদম সন্তানকেও রাস্তার ফুটপাতে পড়ে থাকা লাগতো না। সকলেরই নিজস্ব বাড়ি থাকতো এবং উপার্জনের কোনো না কোনো ব্যবস্থা থাকতোই। এসব কারণেই দ্বীনে হকের তালিকার মধ্যে অপব্যয় নেই।

মানুষ কত ব্যাপারে যে অপব্যয় করে তার তালিকা তৈরি করলে বিরাট বড় পুস্তক হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে তা করা হলো না। শুধুমাত্র অনুমান করার জন্য কিছু বলা হলো। এভাবে যেটাই বনি আদমের জন্য ক্ষতিকর সেটাই দ্বীনে হকের তালিকায় নেই। আর যেটাই আল্লাহর বান্দাহদের জন্য লাভজনক সেটাই আছে দ্বীনে হকের তালিকায়।

আমরা যারা দ্বীনে হকের অনুসারী তারা যদি সত্যি দ্বীনে হককে আমাদের দেশে কায়েম করতে পারতাম তাহলে একদিকে যেমন কায়েমী স্বার্থবাদীরা চিৎকার শুরু করতো এর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে তেমনিভাবে পার্শ্ববর্তী দেশের লোকগুলোও যার যার দেশে চিৎকার শুরু করতো যে, আমরাও চাই ইসলাম, চাই দ্বীনে হক, চাই মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকার।

www.pathagar.com

এভাবে দ্বীনে হকের তালিকার মধ্যে অনেক কিছুই নেই অর্থাৎ যা-ই ক্ষতিকর তা-ই নেই। কিন্তু এখানে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হলো যেন এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার একটা সূত্র পাওয়া যায়।

আমাদের এ সমাজের সবাই চান 'দ্বীনে হক' কায়েম হোক। কিন্তু চান না মাত্র গুটিকয়েক লোক যাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গুণে বলা যায়। তারা অবশ্য বাধা দিয়ে কিছু করতে পারে না। কিন্তু দ্বীনে হকের সঠিক ধারণা সবার নিকট স্পষ্ট নেই বলেই খুব অল্পসংখ্যক লোক দ্বীনে হকের বিরোধিতা করে সফলকাম হচ্ছে। এখন চাই শুধু সবার মধ্যে দ্বীনে হকের সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দ্বীনে হক 'জ্বি হুজুর'-এর ভূমিকায়

আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামের কিছু কাজ আমরা করতে পারি এবং কিছু কাজ করতে পারি না। যেমন নামায-রোযা করতে পারি। আরবী ভাষায় কালেমা পড়তে পারি, দাড়ি রাখা, টুপি পরা, মিলাদ পড়া, কবর যিয়ারত করা ইত্যাদি অনেক কিছুই আমরা করতে পারি। আবার চুরি করলে হাতকাটা, জেনা করলে বেত্রাঘাত করা, এই ধরনের বেশ কিছু কাজ আমরা করতে পারি না।

এখন প্রশ্ন, যা আমরা দ্বীনের হুকুম হিসেবে পালন করতে পারি তা কেন পারি এবং যা পারি না তা কেন পারি না। হিসাব করলে দেখা যায় যেটুকু দ্বীনের হুকুম পালন করার অনুমতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আছে অথবা যেটুকু পালন করায় কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না সেইটুকুই পালন করতে পারি আর যেটুকু পালন করার অনুমতি নাই অথবা যা পালন করতে গেলে কোনো বাধা আছে সেইটুকু পালন করতে পারি না।

এর থেকে প্রমাণ হলো যে, বর্তমানে দ্বীনে হক তার নিজস্ব পথে চলতে গেলে অন্যের অনুমতির প্রয়োজন হয়। অন্যকে চলার জন্য দ্বীনে হক কোনো অনুমতি দেয়ার অধিকার রাখে না। এই অবস্থার নামই দ্বীনে হককে 'পরাজিত' বা 'মাগলুব' অবস্থায় থাকা।

আর যদি সমাজের যেকোনো কাজের জন্য দ্বীনে হকের হাতে অনুমতি দেয়া বা না দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকতো তাহলে ঐ অবস্থাকে বলা যেত দ্বীনে হক 'গালিব' বা 'বিজয়ী' অবস্থায় রয়েছে। যেমন বর্তমানে দ্বীনে

www.pathagar.com

হককে মাগলুব থাকার কারণে কেউ যদি দ্বীনে হকের নির্দেশ অনুযায়ী চোরের হাত কাটতে চায় তাহলে সমাজে যে ব্যবস্থা গালিব আছে সে ব্যবস্থা বলবে—'না, হাত কাটার কোনো অনুমতি হবে না।'

ব্যস, এতটুকু বলে দিলেই দ্বীনদাররা চুপ হয়ে যায়। কারণ তাদের করার কিছুই নেই এ কারণে যে, দ্বীন তো অন্যকে অনুমতি দেয় না, সে অন্যের কাছে অনুমতি চায়। যদি দ্বীনে হকের হাতে অনুমতি দেয়ার ক্ষমতা থাকতো তবে সিনেমা, মদ, জুয়া, সুদ ইত্যাদি যেকোনো সমাজবিরোধী বা দ্বীনে হকবিরোধী কোনো কাজের অনুমতি চাইলে দ্বীনে হক বলে দিতো— 'যাও, অনুমতি হবে না।' ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তারা চুপচাপ ফিরে যেতো যেমন দ্বীনের কিছু কিছু কাজের অনুমতি না পেয়ে দ্বীনদাররা এখন চুপচাপ ফিরে আসে।

একটা বিষয় আমরা চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারি যে, ব্রিটিশ সরকার যেভাবে সুদ, মদ, জুয়া ইত্যাদির লাইসেন্স দিলো সেগুলো আসলে কিসের লাইসেন্স? তা প্রকৃতপক্ষে ছিল আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করার লাইসেন্স। আর সে লাইসেন্স এখনো বহাল রয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যেহেতু দ্বীনে হকের নির্দেশ প্রতিপালিত হবে কি না তা নির্ভর করে অন্যের অনুমতি দানের উপর তাই স্পষ্টই বলা চলে যে, দ্বীনে হক গালিব বা অনুমতি দেয়ার ভূমিকায় নেই, আছে অনুমতি চাওয়ার বা 'জ্বি হুজুর'-এর ভূমিকায়।

কি আফসোস যে, পৃথিবীতে এত দ্বীনদার লোক জীবিত থাকা অবস্থায়ও দ্বীনে হক আজ অনুমতি চাওয়ার ভূমিকায়। ধিক আমাদের চিন্তা-ভাবনার আর ধিক আমাদের ঈমানদারীর! সমাজে এত আলেম-ওলামা থাকা সত্ত্বেও কি আমরা لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ এর হাকীকত বুঝবো না, আর দ্বীনে হককে 'জ্বি হুজুর'-এর ভূমিকায় দেখেও কি নীরবে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবো?

ইসলাম বিজয়ী থাকলে কি লাভ হতো

ইসলামকে বিজয়ী অবস্থায় রাখতে পারলে লাভটা কি হতো আর বর্তমান 'জ্বি হুজুর'-এর ভূমিকায় থাকায় ক্ষতিটা কি হচ্ছে আসুন তা একটু খতিয়ে দেখি।

www.pathagar.com

একটি সহজ যুক্তি হচ্ছে এই যে, যে দলের হাতে ক্ষমতা থাকে সমাজের অধিকাংশ লোক সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য সেই দলের সমর্থক হয়ে পড়ে। যেমন মুসলিম লীগ সরকারের আমলে দেখেছি রাতারাতি সারাদেশের সকল লোক মুসলিম লীগার হয়ে পড়লো। ঠিক তেমনি দেখেছি আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির আমলে। যদি ইসলাম বিজয়ী অবস্থায় বা ক্ষমতায় থাকতো তাহলে সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে রাতারাতি সবাই হয়ে পড়তো ইসলামপন্থী। প্রথমে তারা হতো লোক দেখানো ঈমানদার। এরপর পরিবেশই তাদেরকে খাঁটি মুসলমান করে গড়ে তুলতো। এটাই যুক্তি এবং এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

আর ইসলাম যদি 'মাগলুব' বা 'পরাজিত' বা 'জ্বি হুজুর'-এর ভূমিকায় থেকে অনুমতি চাওয়ার তালেই থাকে, তাহলে সমাজের লোকগুলোর মনের ঝোঁক ইসলামের দিকে থাকলেও পরিবেশ-পরিস্থিতি তাদের জ্ঞানের অগোচরে তাদেরকে বে-ঈমান করে গড়ে তোলে। এটাই যুক্তি এবং এটাই ইতিহাস থেকে প্রমাণিত।

এসব কারণেই অর্থাৎ সঙ্গত কারণেই দ্বীনে হককে 'গালিব' রাখার নির্দেশ দিলেন আল্লাহ।

কিন্তু যারা পরকালে বিশ্বাসী না তারা দুইটি প্রধান কারণে দ্বীনে হককে সমাজে কয়েম হতে দেয়ার ঘোর বিরোধী। কারণদু'টি হচ্ছেঃ ১. প্রভুত্ব, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং ২. অর্থ-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখার মোহ। এ মোহগ্রস্তরা তাদের জ্ঞানের অগোচরেই মুশরিক হয়ে পড়ে। এজন্যই আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন-وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ যদিও মুশরিকরা দ্বীনে হক গালিব হওয়া পছন্দ করবে না কিন্তু তবু মুশরিকদের শত বাধা সত্ত্বেও পরকালের নাজাতের জন্য ঈমানদারদের দ্বীনে হককে গালিব করার কাজ করতে হবে।

জিহাদের নির্দেশ
১০ থেকে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা

এখানে বলা হয়েছে—'ওহে যারা ঈমান এনেছো! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলবো যা তোমাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচাবে?'

www.pathagar.com

এ কথার মাধ্যমে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো যে, বিশ্বাস করলেই বেহেশত পাওয়া যায় না। বেহেশত পেতে হলে তাকে আরো কিছু কাজ করতে হয় এবং আর যে কাজ করতে হয় তা ঈমান ছাড়াও করা যায় না, অথবা বলা চলে যে, বেহেশত পাওয়ার জন্য ঈমান যেমন একটা শর্ত তেমনি ঈমানের দাবি অনুযায়ী আরেকটা কাজও করা শর্ত, যে কাজকে আল্লাহপাক বলেছেন 'একটা ব্যবসা'।

এবার দেখা যাক আল্লাহ মুক্তির জন্য কি ব্যবসা করতে বললেন। যে ব্যবসার কথা বললেন তার মূলধন স্বরূপ বলা হয় ঃ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসই হলো সে ব্যবসায়ের মূলধন।

অতঃপর প্রশ্ন, এই মূলধন দিয়ে কোন ব্যবসায় করতে হবে, সে ব্যবসায়ের নাম কি?

বলা হলো, সে ব্যবসায়ের নাম 'জিহাদ'। আর সে জিহাদ দুনিয়ার কোনো ধন-সম্পদের জন্য নয়, বরং তাহলো আল্লাহর দ্বীনকে (যে দ্বীনকে বলা হয়েছে 'দ্বীনে হক') সমাজে কায়েম করে দেয়ার জন্য।

এখানে একটি মহাসত্যের প্রতি আমরা লক্ষ্য করতে পারি, তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় এ পর্যন্ত যত মতবাদই জন্ম নিয়েছে তার সবক'টিই দু'টি দাবি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে–তা সে মতবাদ সত্যই হোক বা মিথ্যাই হোক। যথা ঃ

১. আমাকে বিশ্বাস করো, আমিই দুনিয়ায় শান্তি কায়েম করতে সক্ষম।

২. আমাকে শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে না, আমাকে দুনিয়ার বুকে কায়েম করতে হবে, তবেই আমি শান্তি দিতে পারবো।

আর কায়েম করতে হলেই জিহাদ করা লাগবে। কারণ বিনা জিহাদে এ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো মতবাদই কায়েম হয়নি। যেমন দেখুন এক মতবাদ গজালো চীনে, নাম তার 'মাওবাদ'। সে মতবাদের ১ম দাবি অনুযায়ী তা অনেকেই বিশ্বাস করলো। শুধু বিশ্বাস করলেই মতবাদের দাবি পূরণ হয় না, তাই সে মতবাদের ২য় দাবি অনুযায়ী মাওবাদে বিশ্বাসীরা তা কায়েম করতে চাইলো।

তখন মাওবাদে বিশ্বাসীদের সামনে প্রশ্ন এলো, কিভাবে তা কায়েম করবে? মতবাদ জবাব দিলো, জীবন-মরণ সংগ্রাম করো (জিহাদ করো),

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে উৎখাত করো, পরে আমাকে কায়েম করো, তাহলেই আমি তোমাদের জীবনে শান্তি দিতে পারবো।

তারা জীবন-মরণ সংগ্রাম করলো। প্রায় দেড় কোটি লোক জীবন দেয়ার পর চীনে 'মাওবাদ' কায়েম হলো।

তেমনি আরেক মতবাদ জন্ম নিলো রাশিয়ায়, নাম তার 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ'। তারও ১ম দাবি অনুযায়ী অনেকে তা বিশ্বাস করলো। প্রায় সোয়া কোটি লোক জীবন দেয়ার পর সেখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কায়েম হলো।

অল্প দিনের জন্য হলেও বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল এক 'মতবাদ', নাম ছিল তার 'মুজিববাদ'। মতবাদের দাবি অনুযায়ী তার বিশ্বাসীরা জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম (জিহাদ) করলো। বহু লোকের জীবনও গেল, তবেই তা কায়েম হলো। যদিও তা বেশি দিন টিকেনি, তবু তার জন্য সংগ্রাম করা লেগেছিল।

এ সবকিছু থেকে প্রমাণ হলো যে, মতবাদ ভুলই হোক আর ঠিকই হোক, বিনা জিহাদে তা কায়েম হয় না, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। ইসলাম একটা মতবাদ। তারও প্রথম দাবি ছিল–'আমাকে বিশ্বাস করো।'

কিছু লোক বিশ্বাস করলো।

মতবাদ বিশ্বাসীদের নিকট তার ২য় দাবি জানালো–'আমাকে কায়েম করো।'

প্রশ্ন হলো কিভাবে কায়েম করা যাবে? জবাব এলো–

تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ـ

অর্থ : জিহাদ করো তোমাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায়।

ইসলামে বিশ্বাসীরা তাই করলো। মাল দিয়ে, জান দিয়ে জিহাদ করলো। ফলে দ্বীন ইসলাম বা দ্বীনে হক আরব জাহানে কায়েম হলো।

আল্লাহ বললেন, এ জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও এর উপকারিতা যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারতে যে ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ –'এটা তোমাদের জন্য কতই না উত্তম।'

মানুষের মধ্যে যারাই কোনো না কোনো ব্যবসা করে তাদেরই পূর্বে জ্ঞান থাকা দরকার যে সে ব্যবসায় কি লাভ হবে। না হলে ব্যবসায়ে কারো মন বসে না। তাই আল্লাহ বললেন– يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ এ ব্যবসার

www.pathagar.com

১ম লাভ হলো এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের সব গুনাহখাতা মাফ করে দিবেন। আর ২য় লাভ হলো এই যে–

يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط

আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে নদীনালা প্রবাহিত এবং যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের স্থায়ী বসবাসের ঘর। আর এইটাই হচ্ছে– ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ সবচেয়ে বড় লাভ, যার থেকে বড় লাভ আর হতে পারে না।

এরপর আল্লাহ্ বলছেন 'জিহাদ' নামক ব্যবসার স্থায়ী লাভ যে দু'টি তা তো শুনলেই, এরপর আরো একটি লাভ তোমরা মনে মনে কামনা করো, আর তা হচ্ছে–

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَّبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

আর অন্য একটি জিনিস যা তোমরা পছন্দ করো তা হচ্ছে আল্লাহ্র সাহায্য এবং আশু বিজয়। (হে নবী) বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দিন (তোমরা তা-ও পাবে)!

এরপর প্রশ্ন, রাসূলে পাক (সা) তো কাফের-মুশরিকদের সাথেজিহাদ করেছিলেন, আমরা এখন জিহাদ করবো কাদের সাথে? এ প্রশ্নের জবাবও রয়েছে আল-কুরআনের সূরা তাওবার মধ্যে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ *

التوبة - ٢٩

যুদ্ধ করো তাদের সাথে যারা (আহলে কিতাব হয়েও) আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী নয়, আর আল্লাহ্ এবং তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা যারা ত্যাগ করেনি এবং আল্লাহ্ যে সঠিক জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন সেই জীবনব্যবস্থা যারা নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেনি (যুদ্ধের হুকুম তাদেরই বিরুদ্ধে)।

www.pathagar.com

যুদ্ধ করো তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা নিজ হাতে জিযিয়া কর দেয় এবং অধীনতা স্বীকার করে।

রাসূল (সা)-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ ছিল তাবুকের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরই উপরিউক্ত আয়াত শরীফ নাযিল হয়। এই যুদ্ধের পরই তাবুকের পার্শ্ববর্তী এলাকার ছোট ছোট অঙ্গরাজ্যগুলো মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে ও জিযিয়া কর দিতে রাজি হয়।

আলোচ্য আয়াতে ঐসব লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে যারা একদিকে আল্লাহকে ও পরকালকে মুখে মানলেও প্রকৃতপক্ষে মানে না এবং অন্যদিকে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহন করে না এবং যা হালাল তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করে না।

এখানে নাম ধরে কোনো জাতির লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা হয়নি অর্থাৎ হিন্দু বা খ্রিস্টান বা অন্যকোনো জাতির নাম করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা হয়নি।

যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তেমনভাবেই গ্রহণ করতে পারে না যেমন অ্যাল্ড্রিনকে বিষ বলে বিশ্বাস করার পর তা কেউ পান করতে পারে না। আল্লাহ বিশ্বাসীগণ অ্যাল্ড্রিনের চেয়ে লাখো লাখো গুণ বেশি ভয় করে গুনাহর কাজকে। আর এ ভয় যাদের নেই তারাই যাবতীয় অন্যায় ও জুলুম-অত্যাচারের কাজে লিপ্ত হয়। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধের হুকুম নাযিল হলো। হুকুম হলো শুধু যুদ্ধের নয়, যুদ্ধ করে দ্বীন কায়েম করার। যে হুকুম পরবর্তী আলোচনায় আসছে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার হুকুম ও হুকুম পালনের ধারা

আল্লাহ সূরা আশ-শূরার ১৩ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ *

অর্থ ঃ আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি তোমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট জীবন বিধান যা কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে, আর তারই

www.pathagar.com

নির্দেশ দিচ্ছি তোমাকেও। এই একই নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকেও যে, তোমরা দ্বীনকে সমাজে কায়েম করো। আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনো মতবিরোধ কোর না। তুমি লোকদেরকে যার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো তা মুশরিকদের জন্য খুবই দুর্বহ (বা অসহনীয়)। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে তিনি দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এর সঠিক ব্যাখ্যার জন্য সাহায্য করবে এই সূরার প্রথম দিককার কয়েকটি আয়াত। বিশেষকরে লক্ষ্য করুন ৪ ও ৫ নম্বর আয়াতের দিকে যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ - تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ط اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ ঃ আকাশমণ্ডলী ও জমিনে যা কিছু আছে সব-ই তাঁর। তিনিই বড় উচ্চ মর্যাদার বিরাট মহান। আকাশমণ্ডল উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম করছিল। এতে ফেরেশতারা তাদের রবের হামদ্ সহকারে তাসবীহ করতেছিল এবং দুনিয়াবাসীদের জন্য তাদের রবের নিকট ক্ষমা চাইতেছিল। সাবধান! প্রকৃতই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

প্রশ্ন, আকাশ ও জমিনের সবকিছু তো আল্লাহর-ই। একথা তো প্রত্যেকেই জানি ও মানি। কিন্তু তারপরও কেন বলা হলো যে আকাশে ও জমিনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই?

একথা বলার অর্থ হলো, তাঁর সৃষ্টির উপর নিরংকুশ কর্তৃত্বও তাঁরই। আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ হয়ে আল্লাহর সৃষ্ট অন্য মানুষের উপর নমরূদ, ফেরাউন ও শাদ্দাদের মতো কর্তৃত্ব করবে এটা ছিল ফেরেশতাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। এটা তাঁদের চিন্তার বাইরে। আর এটা এমন চরম আল্লাহ দ্রোহিতা যে, এতে মাথার উপর থেকে আকাশ ভেঙ্গে পড়ার কথা। এটা বুঝানোর জন্যই বলা হয়েছে ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ -

অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে মানুষের তৈরি বিধানের আনুগত্য করবে–এটা এতবড় অপরাধ যে, এতে যেন আকাশ

www.pathagar.com

ফেটে যাওয়ার ও ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম করছিল, তাই ফেরেশতারা মানুষের জন্য ব্যস্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত হলেন এবং আল্লাহ্ তা মঞ্জুর করলেন। কারণ তিনি 'গাফুরুর রাহীম'। কিন্তু এ ক্ষমার অর্থ হলো সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে গজব নাযিল না করে সংশোধনের জন্য একটা সর্বশেষ সীমায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত সময় দেয়া। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে লোকদেরকে সাবধান করে দেয়ার সিলসিলা চালু রাখলেন। যেন মানুষ ভূল-ভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং একমাত্র আল্লাহ্রই দেয়া বিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলতে পারে। অতঃপর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-কেও আল্লাহ্পাক ঐ একই কথা বুঝানোর জন্য বললেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের জীবনযাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ ও পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছেন যেন সেই পন্থায় জীবনযাপন করে পৃথিবীতে শান্তি লাভ করতে পারো এবং পরকালেও মুক্তি পেতে পারো।

অতঃপর হুকুম হলো। اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ –'সেই নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থাকেই আল্লাহর জমিনে কায়েম করো।' এ প্রসঙ্গে বলা হলো, এ ধরনের কড়া হুকুম বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার হুকুম যা পালন করতে গেলে কঠোর সাধনা ও নানাধরনের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করা লাগবে তা শুধু তোমাকেই করা হলো না বরং এই একই হুকুম করা হয়েছিল নূহ (আ) -কে যা পালন করতে তাকে কম কষ্ট করতে হয়নি এবং যার জন্য ছোট-খাট বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়নি বরং বিরাট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর এই একই হুকুম পালন করতে গিয়ে হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-কেও অনেক বড় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার কাজ যেহেতু কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরোধিতা মোকাবিলার কাজ, তাই এ কাজ কখনো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে করার মতো কাজ নয়। এ কাজ সম্মিলিতভাবে করার কাজ, তাই বলা হলো وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ অর্থাৎ এ কাজে কেউ কোনো প্রকার মতবিরোধ কোর না। তোমরা সুসংগঠিতভাবে ঐকান্তিক চেষ্টার মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করো। কারণ তোমরা যা করতে চাও তা যেহেতু কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থবিরোধী তাই তাদের নিকট এ কাজ হবে كَبُرَ عَلَى

www.pathagar.com

اَلْمُشْرِكِيْنَ। –'মুশরিকদের জন্য খুবই অসহনীয় এবং খুবই দুর্বহ', তাই তারা এতে বাধা দিবে তাদের সাধ্যানুযায়ী। আর সেসব বাধাকে অতিক্রম করে এ কাজ তোমরা করতে পারবে তখন, যখন তোমরা আল্লাহবিশ্বাসীগণ পরস্পর সম্মিলিতভাবে এ কাজে হাত দিতে পারবে। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ করলে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার পথে প্রকারান্তরে বিরোধিতাই করা হবে।

আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার অর্থ আরো কিছুটা সহজ করে বলার চেষ্টা করছি ঃ

লক্ষ্য করুন, আমরা বর্তমানে ঘর থেকে রাস্তায় বের হয়েই যেসব আইন-কানুন মেনে চলি তার মধ্যে আল্লাহর আইন খুঁজে বের করা খুবই মুশকিল। যেমন গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হয়েই রাস্তার ব্যম পাশ দিয়ে চলা শুরু করি। কিন্তু এটা ইসলামের বিধান নয়। ইসলামের বিধান হলো যেকোনো কাজই ডানদিক থেকে করা।

এরপর রাস্তা বেয়ে আপনি কোথায় যাবেন, চলুন। দেখুন সেখানে কি আইন চালু আছে। আপনি উঠলেন বাসে, দেখছেন মহিলারা পুরুষদের গা ঘেঁষে বসে গেছে। এটা কি ইসলামের বিধান?

চলুন বাস থেকে নেমে কোথায় যেতে চান। যাবেন বাজারে, সেখানে দেখবেন ভেজাল বিক্রি হচ্ছে, ওজনে কম দেয়া হচ্ছে, অতি মুনাফা নেয়া হচ্ছে ইত্যাদি অনেক কিছুই হচ্ছে যা ইসলামে নেই।

এরপরে কোথায় যাবেন চলুন। যাবেন কোর্টে! আচ্ছা তাই চলুন, দেখুন যে মামলার ডাক পড়লো, তাকে জিজ্ঞেস করুন কয় বছর থেকে চলছে, এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং কত টাকা ব্যয় হচ্ছে। এরপরও কি বাদীর এ ভরসা আছে যে, তিনি ঠিক যথাযথ সুবিচার পাবেন?

আমি এর অর্থ এ বলতে চাইনি যে, বিচারক সঠিক বিচার করবেন না। আমি বলতে চাচ্ছি যে, বিচারকের সাহায্যকারী উকিল ও সাক্ষীগণ কি বিচারককে ন্যায় বিচার করতে সাহায্য করবেন, বা করতে দিবেন?

এরপরও দেখছেন একটা মামলার রায়ে বলা হলো, অমুক চোরকে এক বছর জেল দেয়া হলো। কিন্তু এটা কি আল্লাহর বিধানে আছে? এভাবে যেখানেই যাবেন এবং গিয়ে যা-ই দেখবেন তাতে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন যে, যা আল্লাহর বিধান তা সমাজে কায়েম নেই, আর যে ব্যবস্থাপনাই সমাজে কায়েম আছে, দেখবেন তার সঙ্গে আল্লাহর বিধানের কোনো মিল নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার অর্থ হলো সমাজের যেদিকেই নজর করবেন,সেদিকেই দেখবেন যে, যা আছে কুরআনে তা-ই আছে সমাজের সর্বত্র। এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করার নামই হলো আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা। অর্থাৎ সমাজের আইন-আদালত হোক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক কিংবা কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান হোক অথবা সিনেমা-টেলিভিশন হোক কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ হোক, যা-ই হোক না কেন তা সব-ই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হতে হবে। তবেই হবে সে সমাজের লোকদের দ্বীনের উপর কায়েম থাকা; নইলে নয়।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে এ কথাও স্পষ্ট করে বুঝানো হয়েছে যে, যেকোনো ব্যাপারেই যদি আল্লাহর বিধানের সাথে আর কারো তৈরি বিধানের বিরোধ সৃষ্টি হয় তবে অবশ্যই আল্লাহর বিধানটাই টিকবে এবং অন্য বিধান যা আল্লাহর বিধানের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী তা টিকবে না। আর যদি তা টিকানো হয় তবে আল্লাহকেও মানা হয় না এবং আল্লাহর বিধানকেও মানা হয় না।

পূর্বে বলা হয়েছে যেহেতু আল্লাহর বিধানে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থহানীকর ব্যবস্থা রয়েছে তাই তারা তাদের অবৈধ স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে জান-প্রাণ দিয়ে হলেও লড়বেই, আর মুসলমানদেরও আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হবে। কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে চরম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে হলেও আল্লাহর দ্বীন সমাজে কায়েম করতেই হবে, না হলে যেমন নেই ইহকালের সামাজিক শান্তি তেমনি নেই পরকালের মুক্তি।

এখন প্রশ্ন, আল্লাহর নবী (সা) এ দ্বীন কায়েম কিভাবে করেছিলেন এবং আমরা তা কিভাবে করতে পারি।

এ দ্বীন কায়েম করার অর্থ হলো সমাজের যাবতীয় আইন-কানুন বা গোটা সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আনা। এমন পরিবর্তন আনা যে পরিবর্তনের আগের ব্যবস্থার কিছুই আর পরিবর্তিত ব্যবস্থার মধ্যে না থাকে। যেমন একটা গোলপাতার ঘরের স্থলে যদি একটা পাকা বিল্ডিং করা হয় তবে গোলপাতার ঘরকে যেমন প্রথমে ভেঙ্গে ফেলতে হবে তারপর নতুন ভিত্তির উপর নতুন বিল্ডিং তৈরি করতে হবে। আর নতুন বিল্ডিং তৈরির সময় ঐ গোলপাতার ঘরের যেমন কিছুই আর বিল্ডিং-এ খাটানো যায় না ঠিক তেমনি মানব রচিত ব্যবস্থাপনার সমাজে যদি দ্বীন কায়েম করতে হয় তবে কায়েম থাকা যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকেই প্রথমে ঐ গোলপাতার ঘরের মতো ভেঙ্গে ফেলতে হবে। পরে নতুন মূলনীতিকে

www.pathagar.com

ভিত্তি করে ঐ ভিত্তির উপর নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

তবে কোনো গোলপাতার মসজিদ ভেঙ্গে যদি পাকা বিল্ডিং করা হয় তবে যেমন একপাশ দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গা হয় এবং ক্রমান্বয়ে এক পাশ গড়া পর্যন্ত অন্য পাশের না ভাঙ্গা অংশে নামায আদায় করা হয় তেমনি একটা সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে এক দিনেই একটা নতুন সমাজ গড়া সম্ভব নয়। তাই ক্রমান্বয়ে এ কাজ করতে আমাদের রাসূল (সা)-এর ২৩ বছর সময় লেগেছিল।

সমাজের আমূল পরিবর্তনকে বাংলায় বলা হয় 'বিপ্লব'। যারাই বিপ্লবের কথা বলেন তারাই আসলে একটা আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন। আমাদের দেশে যারা রুশপন্থী তারা যখন বিপ্লবের কথা বলেন তখন তার অর্থ হয়, সমাজের বর্তমান যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকে তুলে দিয়ে রাশিয়ার মতো একটা নাস্তিক্যবাদী সমাজ তারা গড়তে চান।

আর যখনই চীনপন্থীরা বিপ্লবের কথা বলেন তখন তার অর্থ হয়, তারা চীনের মতো একটা সমাজ গড়তে চান।

আর ভারতপন্থীরা যখন বিপ্লবের কথা বলেন তখন তার অর্থ দাঁড়ায় তারা ভারতের মতো একটা সমাজ গড়তে চান আর যখন ইসলামপন্থীরা বিপ্লবের কথা বলেন তখন তার অর্থ হয় তারা রাসূলের (সা) গড়া সমাজের ন্যায় একটা সমাজ গড়তে চান।

কিন্তু এ কথা তিক্ত হলেও সত্য যে সমাজের যাবতীয় আইন কানুন, প্রথা প্রচলন ইত্যাদি সব কিছুর আমূল পরিবর্তন করে সমাজে কিভাবে দ্বীন ইসলাম কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব সে সম্পর্কীয় কোনো শিক্ষা দীক্ষা আমাদের সমাজে নেই। সুতরাং যতই আমরা চিৎকার করিনা কেন যতদিন না রাসূল (সা) এর সমাজ বিপ্লবের ধারা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা না যাবে এবং সেই অনুযায়ী দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দ্বারা সমাজে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব হবে না। আমার এ কথার স্বপক্ষে একটা যুক্তি পেশ করছি।

চিন্তা করুন আমাদের দেশে এমন কোনো দিন নেই যে দিন দেশের বিভিন্ন এলাকায় হাজার দ্বীনি মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে না এবং বড় বড় নাম করা বক্তাদের ওয়াজ নছিহত হচ্ছে না কিন্তু তার ফল কতটুকু মিলতেছে। ফল যে কিছুই হচ্ছে না আমি তা বলছি না তবে যতটুকু হচ্ছে তাতে কি দ্বীন সমাজে কায়েম হওয়ার পথে বলে মনে হয়? এ ব্যাপারে আমার একটা

www.pathagar.com

হিসাব নিন অতঃপর আপন মনে চিন্তা করে দেখুন আমার এ হিসাব ঠিক না বেঠিক। আজ থেকে কমপক্ষে ৪০/৪৫ বছর পূর্বের ওয়াজ নছিহত এবং সমাজের ইসলামী আমল আখলাক যেটুকু আমি নিজের চোঁখে দেখেছি তা এবং আজ যা দেখছি তার মধ্যে যতটুকু ব্যবধান আমি লক্ষ্য করছি তা স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য নিম্নে কয়েকটা উদাহরণ হাজির করছি। যথাঃ আমার মনে পড়ে ইংরেজী ১৯৩৫ সালে ফুরফুরার মরহুম পীরে কামেল হযরত আবু বকর (র) এর মুখে যখন প্রথম পর্দার ও গানের ওয়াজ শুনেছি তখন সমাজের অবস্থা ছিল এমন যে মুসলমানের মেয়েরা বেপর্দায় ছিল ঠিকই কিন্তু তাদের বেপর্দায়ী ছিল বাড়ীর ভিতরে। অর্থাৎ দেবর, ভগ্নিপতি, স্বামীর ভগ্নিপতি, চাচাত ভাই, মামাত ভাই, খালাত ভাই, পাশের বাড়ীর লোক ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা গায়ের মুহারিম তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার মধ্যেই ছিল বেপর্দা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই দীর্ঘ ৪০/৪৫ বছর ধরে আরো কত হাজারও মুখে পর্দার ওয়াজ হচ্ছে কিন্তু তাতে পর্দা-পালন কতটুকু হচ্ছে? উন্নতি এতটুকু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তখন কোনো মুসলমান মহিলা যদি কোনো বিপাকে পড়ে কোনো গায়ের মুহরিম পুরুষের সামনে দিয়ে ২ পা পথ চলেছে তবে তাদের চলা দেখলে মনে হত যেন পায়ে কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছে, যেন হুচট খেয়ে পড়ে আর কি। ...তারা লজ্জায় কারো সামনে দিয়ে হাঁটতে পারত না। আর আজ? তখন মুসলমান মেয়েদের দেখেছি কাপড় পরত নাভীর ২ ইঞ্চি উপরে, ব্লাউজের ঝুল ছিল ২৪/২৫ ইঞ্চি। গলার ফাঁক ছিল ১৩´ /১৪´ ইঞ্চি, তারা ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন সর্বক্ষণই। আর আজ? আজ দেখেছি কোনো মুসলমানের মেয়ে রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখলে সবাই মনে করতো সম্ভবতঃ তাঁর কোনো নিকটতম লোক মরণাপন্ন হয়েছে অথবা মারা গিয়েছে তাই কোনো গাড়ির অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটেই তাকে দেখতে যাচ্ছে, একথা সবাই মনে করতেন। কিন্তু আজ? আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে মানুষ গান গাইত ঠিকই কিন্তু তারা কখনও মুসলমানদের বাড়ীর পাশ দিয়ে গান গেয়ে যেত না। আর আজ? এবার বলুন এত ওয়াজ নছিহত হওয়া সত্বেও এবং দেশটা মুসলমানদের শাসনাধীন হওয়া সত্বেও আজ কেন সমাজের সর্বত্র এই গায়ের ইসলামী কার্যকলাপ? এর কারণ কি?

পক্ষান্তরে রাসূলে পাক (সা) মাত্র ২৩ বছরে গোটা আরব জাহানের চরিত্রের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিলেন যা একেবারেই নজীর বিহীন। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা) যামানায় মানুষ জ্যান্ত মেয়েকে কবর

www.pathagar.com

দিত, মারা-মারি, কাটা-কাটি, খুনা-খুনি ছিল যাদের নিত্য নৈমিত্তিকার কাজ তারাই এমন চরিত্রবান হলো যে, রাসূল (সা) এক দিন মদিনা থেকে বললেন, "আজ এখান থেকে হাজরামাউথ পর্যন্ত কোনো সুন্দরী নারী যদি একা একা পায়ে হেঁটেও চলে যায় তবুও তার দিকে কেউ ফিরে তাকাবেনা।

মাত্র ২৩ বছরে এমন চরিত্রবান করে কিভাবে তাদের গড়ে তুললেন? শুধু কি ওয়াজ নছিহতের মাধ্যমে? না কি বিপ্লবী কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে? আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটি কাজের একটা বিশেষ ধারা বা পদ্ধতি থাকে সেই ধারা বা পদ্ধতি বাদ দিলে আর তা হয় না। যেমন একই ধান থেকে চিড়া হয়, মুড়ি হয়, ভাত হয়, আরো অনেক কিছু হয় কিন্তু তার প্রত্যেকটি তৈরির এক একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। পদ্ধতি বাদ দিলে আর তা হয় না যেমন চিড়ের পদ্ধতিতে ভাত হয় না এবং ভাতের পদ্ধতিতেও মুড়ি হয় না। ঠিক তেমনই ইসলামী সমাজ গড়ার যে পদ্ধতি রাসূলের (সা) ছিল সে পদ্ধতি বাদ দিলে কোনো দিনও ইসলামী সমাজ কায়েম হবে না এবং কোনো দিনও দেশের সাধারণ মানুষের চরিত্র ছাহাবাদের (রা) মত হবে না। হাঁ, হবে ঠিকই কিন্তু তা কক্ষণও রাসূলের (সা) পদ্ধতি বাদ দিয়ে হবে না। রাসূলের (সা) সেই পদ্ধতিটি যে কি ছিল তা-ই দেখান হয়েছে এই অধ্যায়ের শেষে ছকের মাধ্যমে। আমার বিশ্বাস এ ছককে সামনে রেখে নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে রাসূলের বিপ্লবী কর্মধারাকে বুঝতে খুবই সহজ হবে।

(অনুগ্রহপূর্বক ৩৬-৩৯ পৃষ্ঠার ছকটি দেখুন।)

ছক তৈরি সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথাঃ

১. এ ছকে রাসুল (সা) এর দাওয়াতী কাজের যে পর্যায়গুলো দেখান হয়েছে খুবই সংক্ষেপে তার একটা চিত্র হাজির করা মাত্র।

২. এতে প্রত্যেকটি পর্যায় পার হওয়ার যে সময়কাল দেয়া হয়েছে ওটাও একেবারে নির্ভুল এটা আমার দাবি নয় তবে অনুসন্ধানে যেটা কাছাকাছি হিসাব বলে মনে হয়েছে সেটাই দেখান হয়েছে।

৩. এতে সূরা নাযিলের যে সংক্ষিপ্ত ক্রমিক পর্যায় দেখান হয়েছে তার মধ্যেও কিছু সামান্য আগ পাছ হতে পারে কারণ আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সূরা নাযিলের ধারাবাহিকতা নিখুঁতভাবে উদ্ধার করা এক প্রকার সাধ্যের বাইরে। তবুও মোটামুটি ভাবে হুজুরে পাক (সা)-এর গোটা

www.pathagar.com

কর্মজীবনকে সামনে রেখে এবং সেই সঙ্গে তাঁর উপর নাযিল হওয়া আয়াত ও সূরা বিশেষ করে যেগুলো নাযিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে সবাই একমত সে সব আয়াত ও সূরা এবং সেই সব আয়াত ও সূরার মাধ্যমে পাঠানো আল্লাহর নির্দেশ যেভাবে আমাদের রাসূল (সা) ধারাবাহিকভাবে ও পর্যায়ক্রমে পালন করেছেন তার উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে যে চিত্রটা আমাদের জ্ঞানের সামনে ভেসে ওঠে ঐটাই এ ছকের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও এর কাছাকাছি, এতে সন্দেহ নেই।

৪. এ ভাবে ছকের মাধ্যমে রাসূলের (সা) কর্মধারাকে হাজির করলে রাসূলের বাস্তব কাজ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যত প্রকার অস্পষ্টতা আছে তা খুবই সহজে দূর হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ছককে আরো উন্নতমানের করে তৈরি করার জন্য কেউ কোনো পরামর্শ দিলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

ছক এঁকে দেখানোর উদ্দেশ্য

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ এর মাধ্যমে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর রাসূলকে তা তিনি কিভাবে পালন করলেন তাই দেখান হয়েছে এ ছকের মাধ্যমে। যদিও নবী জীবনের প্রায় যাবতীয় খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কেই আমরা অবহিত আছি তবুও আমার মনে হয় যেন তাঁর (সা) একটা কাজ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা অস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে এই যে, তিনি যে একটা সফল বিপ্লবের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে সমাজের প্রতিটি স্তরে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম করেছিলেন– যা করাটাই ছিল রাসূল হিসাবে তাঁর দ্বীনি দায়িত্ব এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ জান জীবন দিয়েও যেটাকে প্রধান দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে পালন করেছিলেন তা পালন করার ধারাটা কিরূপ ছিল তা আমাদের অনেকের নিকটই অস্পষ্ট। সেই ধারাটাকেই অত্যন্ত সহজভাবে ও স্পষ্ট- করে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে একটা ছকের মাধ্যমে।

এ ছকটাকে সামনে রেখে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে রাসুল (সা) এর প্রধান দ্বীনী দায়িত্ব পালনের ধারাটাও যেমন বুঝতে সহজ হবে তেমন বুঝতে সহজ হবে ২৩ বছর ধরে আল কুরআন নাযিলের পদ্ধতি এবং কুরআন পাকের মূল শিক্ষাগুলোও। বরং এটা স্পষ্ট করেই বলা চলে যে, যাঁরাই রাসূলের (সা) বিপ্লবী কর্মকান্ডকে সামনে না রেখে তাঁকে

www.pathagar.com

(রাসূলকে) এবং আল কুরআনকে বুঝতে চেষ্টা করবেন তাঁরা অত্যন্ত-সংগত কারণেই ব্যর্থ হবেন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ তাঁর (সা) বিপ্লবী কর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে নাযিল হওয়া কিছু আয়াত শরীফ সবার সামনে তুলে ধরতে চাই যার অর্থ হুজুরে পাক (সা) এর বিপ্লবী কর্মধারার সঙ্গে মিল করে না পড়লে এ কথা বুঝাই যাবে না যে তা নাযিল হওয়ার দরকারটা কি ছিল। আর যখনই তা নবী জীবনের বিপ্লবী কর্মধারার সঙ্গে মিল করে পড়া হবে তখনই মনে হবে যেন যে মুহূর্তে যে অহি নাযিল হয়েছিল ঐ মুহূর্তে তা নাযিল হওয়ার প্রয়োজনই ছিল। এ ধরনের কিছু আয়াত উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। এবার লক্ষ্য করুন ছকের দিকে, দেখবেন নিম্নের আর কয়েকটি কথা কত স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আর তা হচ্ছে এই যে–

১. রাসূল (সা) দাওয়াতী কাজের ধারা সারা জীবন একই প্রকার ছিলনা। তা কয়েক বছর অন্তর অন্তর পাল্টে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে প্রবেশ করতেছিল। কিন্তু আমাদের কর্মপদ্ধতির কোনো পরিবর্তন নেই।

২. প্রত্যেক পর্যায়ে দাওয়াতের ধরনটা যেমন ছিল ক্রমিক ধারায় ঠিক সেই অনুযায়ী কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরোধিতাও ছিল ক্রমিক পর্যায়ে অর্থাৎ কঠিন থেকে কঠিনতর।

৩. বিরোধিতাও যেমন ছিল কঠিন থেকে কঠিনতর তেমন তা প্রতিরোধও করেছেন অত্যন্ত ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে। যার জন্য অত্যন্ত কড়া পরীক্ষার ধাপগুলো অতীব ধৈর্য্য ও ঈমানের দৃঢ়তা সহকারে অতিক্রম করতে হয়েছিল।

৪. যা অতিক্রম করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য স্বরূপ অনুপ্রেরণা মূলক অহি নাযিল হচ্ছিল। যে অহির উপদেশকে মূলধন করে রাসূল (সা) তাঁর বিপ্লবী কর্মধারাকে সামনে অগ্রসর করে নিচ্ছিলেন।

৫. ক্রমিক পর্যায়ের যাবতীয় বিরোধিতাকে প্রতিরোধ করে যখন রাসূল (সা) তার বিপ্লবী কর্মধারার এক একটা ধাপ অতিক্রম করতেছিলেন তখন প্রতি ধাপ পার হয়েই কিছু না কিছু ফলাফল লাভ করতেছিলেন যা ছকের মাধ্যমে দেখান হয়েছে।

এবার লক্ষ্য করুন নিম্নের কিছু আয়াত শরীফের দিকে এবং চিন্তা করুন যদি রাসূল সত্যই কোনো বিপ্লবী কর্মসূচী না নিয়ে শুধু লোকদেরকে ছহিশুদ্ধ করে কুরআন ও কালেমা শিক্ষা দিতেন বা ওয়াজ নছিহত করে শুনাতেন কিংবা ওজিফা কালাম শিখাতেন তাহলে এসব আয়াত ও সূরা

www.pathagar.com

নাযিলের কি প্রয়োজন ছিল? আর কেনই বা তিনি মার খেলেন, কেনই বা তিনি 'শীবে আবু তালিব' উপত্যকায় নির্বাসিত জীবন যাপন করলেন, আর কেনই বা হিজরত করলেন, কেনই বা দাঁত ভাঙ্গল এবং কেনই বা যুদ্ধে লিপ্ত হলেন? খুব নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখুন উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর কি জবাব আসবে এবং ঐ ছকটাকে সামনে না রেখেই যদি ঐ প্রশ্নগুলোর জবাব সন্ধান করি তাহলে সন্ধান মিলবে কি? যেমন ছকে দেখান হয়েছে যে প্রথম পর্যায়ে কিছুদিন গোপনে কাজ করার পর যখন সূরা আল মুদ্দাচ্ছির নাযিল হলো তখন আল্লাহ বললেন এখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দাও। يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَانْذِرْ "হে বস্ত্রচ্ছাদিত! উঠে দাঁড়াও, সতর্কবাণী প্রচার করো"। চিন্তা করুন, রাসূল কি তখন কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন যে বলা হলো 'হে কাপড়ে ঢাকা বা বস্ত্রাচ্ছাদিত'? এর অর্থ হলো "হে গোপনে আহবানকারী" ....এবং এর পরে বলা হলো قُمْ বা "উঠে দাঁড়াও" কেন, তিনি তখন কি শুয়ে বা বসেছিলেন? আর এই আয়াত নাযিল হলে কি তিনি উঠে দাড়ালেন? না, তা দাঁড়ান নি? এর অর্থ হলো তোমার প্রথম পর্যায় এখন আর চালু রাখতে পারবে না, এখন তোমাদের দাওয়াতের ২য় পর্যায়। এখন থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দাও। এবার চিন্তা করুন এই ছককে বাদ দিয়ে এ আয়াত শরীফের কি ব্যাখ্যা দেয়া যাবে? অতঃপর চিন্তা করুন এই ২য় পর্যায়ের মধ্যে যে সূরা কাফেরুনের উল্লেখ রয়েছে, যে সূরা সম্পর্কে প্রত্যেক আলেমই (শিক্ষিত) জানেন যে ওটার মধ্যে রয়েছে আপোস প্রস্তাবের জবাব। অর্থাৎ কাফেরদের পক্ষ হতে এসেছিল আপোস প্রস্তাব আর তারই জবাব নাযিল হলো সূরা কাফেরুন। এবার বলুন আপোস প্রস্তাব কখন আসে। আমরাতো কতই দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কৈ কেউই তো আমাদের নিকট আপোস প্রস্তাব নিয়ে আসে না। তার কারণ কি? তার একমাত্র কারণ হলো এই যে, ঐ ছকে দেখানো বিপ্লবী কর্মসূচীর ন্যায় আমাদের কোনো কর্মসূচী নেই। এবার আপনিই বলুন ঐ ছকে দেখানো রাসূলের বিপ্লবী কর্মধারাকে বাদ দিয়ে এ সূরার যৌক্তিকতা কি করে প্রমাণ করা যাবে?

অতঃপর চিন্তা করুন এবং লক্ষ্য করুন সূরা হা-মীম আস্‌সাজদার ২৬ থেকে ৩৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিশেষ করে ৩৪ও ৩৫ নম্বর আয়াতের ছকে

www.pathagar.com

যেখানে বলা হয়েছে ভালো এবং মন্দ কখনই সমান হতে পারে না, সুতরাং মন্দকে প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা [আল্লাহর ভাষা হচ্ছে اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ। (ইদফা' বিল্লাতি হিয়া আহসানু) এরই অর্থ হলো মন্দকে প্রতিহত করো ভালো দ্বারা] এবার বলুন বিপ্লবী কর্মসূচী ছাড়া কিছু কি প্রতিহত করা যায়? এর পর বলা হলো (৩৫ নম্বর আয়াতে) এ কাজ তাদের দ্বারা সম্ভব যারা ছবর করতে পারে আর তাদের দ্বারা সম্ভব যারা ভাগ্যবান। আর ৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হলো "যদি (বিপ্লবের এ পর্যায় অতিক্রম করতে) শয়তান (বেছবর হওয়ার কুমন্ত্রণা দেয় তবে আল্লাহকে স্মরণ করো তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। এবার রাসূলের বিপ্লবী কর্মধারার ৩ নম্বর দাওয়াতী পর্যায়ের 'বিরোধিতা ও প্রতিরোধ' ঘর ২টির দিকে লক্ষ্য করুন আয়াত ক'টার দিকে লক্ষ্য করুন দেখুন বিপ্লবী কর্মসূচীকে বাদ দিয়ে ঐ আয়াতগুলোর কি ব্যাখ্যা দেয়া যাবে? বিপ্লবী কর্মসূচীকে সামনে রেখে ঐ আয়াতগুলোকে বুঝার চেষ্টা করুন দেখবেন ঐ ছকের সঙ্গে এর কত মিল রয়েছে।

এরপর সামনে এগিয়ে দাওয়াতের ক্রমিক পর্যায়ের ৪ নম্বর ঘরের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ ঘরের দিকে লক্ষ্য করুন যা অতিক্রম করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা বাণী আসতে রইল এক বিশেষ ধারায়। পড়ুন ঐ সময়ে নাযিল হওয়া সূরাগুলো। দেখুন রাসুল (সা) কে কাফেররা যখন তার আপন মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিল, তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই 'শীবে আবু তালিবে' গিয়ে আশ্রয় নিলেন। খুব কষ্ট করতে লাগলেন তিনি এবং তাঁর সঙ্গী সাথীগণ। অতীষ্ঠ হলেন সবাই। আর এ সময় হুজুর (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে সূরা নাযিল হতে লাগল। পড়ে দেখুন সূরা আনকাবুতের প্রথম থেকে। যেখানে বলা হয়েছে শুধু ঈমানের দাবি করলেই কি তাকে ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি পরীক্ষিত হবে না? আর পরীক্ষা তো শুধু হুজুর (সা) ও তাঁর সাথীদের জন্যই ছিল না। বলা হলো অবশ্যই এ ধরনের পরীক্ষা পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল। এমনকি সূরা বুরুজে বলা হলো আগুনেও নিক্ষেপ করা হয়েছে ইতিপূর্বে। আর সূরা আ'রাফে এ সময় একে একে বহু নবী রাসূল (সা) গণের ইতিহাস তুলে ধরা হলো এবং তাতে দেখান হলো যে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণও ইকামতে দ্বীনের হুকুম পালন করতে গিয়ে এইরূপই বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন। যেমন সূরা আ'রাফের ৮৮ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বললেন শুধু কি তোমাদেরই

www.pathagar.com

নাগরিকত্ব হরণ করে তোমাদের নির্বাসিত করা হলো? কেননা শোয়াইব (আ) কেও তাঁর কওমের সরদার বলেছিল–

لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا

الا عراف - ٨٨ -

"দেখ শোয়াইব! তোমাকে এবং তোমার সঙ্গী সাথীদেরকে দেশ থেকে অবশ্যই বের করে দেব, তোমাদের নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নেব।" এবার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে চিন্তা করুন সমাজ বিপ্লবের কর্মসূচী যাদের থাকে না তাদেরকে কেউই কি কোনদিন বলে যে তোমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব কিংবা তোমাদের নাগরিক অধিকার হরণ করব? কই আমরা তো দ্বীনের দাওয়াত দেই আমাদের কেউই তো বলে না যে যাও তোমরা দেশ থেকে বেরিয়ে যাও। হিজরাতের পূর্বে শীবে আবু তালিবে অবস্থানকালে এই ধরনের সান্ত্বনাসূচক কথা সহ যেসব সূরা তখন নাযিল হয়েছিল তা আমাদের নিষ্ক্রিয় ইবাদতের কোন্ জায়গায় কাজে লাগবে?

এ প্রসঙ্গে আমরা আরো, নিরপেক্ষবাবে চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারি যে রাসুল (সা) কে যদি اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ (আন আকিমুদ দ্বীন) বা 'দ্বীন কায়েম করো" এই নির্দেশ না দিতেন আর এই নির্দেশ অনুযায়ী যা কাজ করেছিলেন তা যদি না করতেন তাহলে বলুন রাসূল (সা) কেন মার খেলেন এবং এই পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাগুলো নাযিলের কি কারন থাকতে পারে। অতঃপর মনের যাবতীয় বিভ্রান্তিকর ধারণাকে ধুয়ে মুছে ফেলে রাসূলে পাক (সা) এর বিপ্লবী কর্মধারাকে এবং ২৩ বছর ধরে কুরআন নাযিলের কারণকে বুঝবার চেষ্টা করলে অবশ্যই জ্ঞানে ধরা পড়বে যে কি ছিল রাসূলের (সা) আসল দায়িত্ব আর কেমনভাবে তা পালন করেছিলেন এবং কুরআনইবা নাযিল হলো কি নিয়ে। আর কেনইবা তিনি এত নির্যাতন ভোগ করলেন এবং কেনই বা হিজরত করলেন।

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী সমাজ কায়েমের হিজরতের আগে

(মক্কায় ১৩ বছর)

১ দাওয়াত ও আন্দোলনের পর্যায়	২ ক্রমিক পর্যায়ের সময় কাল	৩ বিরোধিতার ধরন	৪ প্রতিরোধের উপায়
ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাতের মাধ্যমে পরিচিত মহলে প্রথম পর্যায়ের দাওয়াত শুরু হলো।	৩ বছর	উপেক্ষা, বিদ্রুপ, ঠাট্টা, তামাশা	দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া
প্রকাশ্যে দাওয়াত, সংগঠন, তা'লীম ও তরবিয়াত।	২ বছর	ঠাট্টা, বিদ্রুপ ও বিরোধী প্রচার	যুক্তি প্রদর্শন ও ঈমানের দৃঢ়তা
ব্যাপক দাওয়াত	৫ বছর	ব্যাপক বিরোধিতা, মারধোর ও জুলুম অত্যাচার	ঈমানের দৃঢ়তা, ছবর ও হিজরাত শুরু
দাওয়াতের প্রসার, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা।	৩ বছর	চরম জুলুম, সমাজ থেকে বহিষ্কার ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ	ঈমানের দৃঢ়তা ও চরম ছবর, হিজরাত অব্যাহত।

www.pathagar.com

পথে রাসূল (সা) এর বিপ্লবী কর্মধারা
হিজরতের আগে
(মক্কায় ১৩ বছর)

৫	৬	
দাওয়াত ও আন্দোলনকে সামনে অগ্রসর করার উপযোগী অহি নাযিলের ধারা (সূরার নম্বর দেওয়া হলো)	ফলাফল	
	(ক) জনসাধারণের অবস্থা	(খ) কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিক্রিয়া
১, ৫৫, ৭২-৭৭ নম্বর সূরা ও আম পারার ২০টি সূরা	অল্প সংখ্যক লোকের ইসরাম গ্রহণ।	কায়েমী স্বার্থবাদীদের কান খাড়া
৬৭, ৩৮, ৭৪, ৮০, ৫০, ৫১, ৭০, ৮৩, ৫২, ৬৯, ৮৮, ৮৬	সাধারণ লোকদের দাওয়াত গ্রহণ শুরু হয়।	গুরুত্ব সহকারে বিরোধিতার চিন্তা ভাবনা।
১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ৩০-৪৫ (৩৮ বাদে) ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৬৮, ৭১, ৭৩, ৮৫, ৮৯, ৯১, ৯২, ১০৮, ১০৯, ১১১-১১৪।	চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও নিরীহদের ইসলাম গ্রহণ অব্যাহত।	দারুন গাত্রদাহ শুরু ও চরম জুলূমের পরিকল্পনা গ্রহণ।
৬, ৭, ১০-১৭, ৪৩, ৪৬, ৯০।	চরম বিরোধিতার মুখে দুর্বল লোক ছাটাই।	সমাজ বিতাড়িত, নির্বাসন, খাদ্য বন্ধের হুমকি, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ ও হত্যার ষড়যন্ত্র।

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী সমাজ কায়েমের
হিজরতের পরে
(মদীনায় ১০ বছর)

১ দাওয়াত ও আন্দোলনের পর্যায়	২ ক্রমিক পর্যায়ের সময় কাল	৩ বিরোধিতার ধরন	৪ প্রতিরোধের উপায়
মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও ২য় পর্যায়ে নতুন ধারায় দাওয়াত ও আন্দোলন।	৬ বছর	ইসলামী বিপ্লবকে বানচালের চেষ্টা, বিদেশে অপপ্রচার মুনাফেকীর আশ্রয় গ্রহণ এবং কুরাইশদের নেতৃত্বে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ।	চরম আত্মত্যাগ, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা সহকারে মুনাফেকী চক্রান্ত বানচাল ও আত্মরক্ষামূলক জিহাদ।
বিপ্লবকে সুসংহত করা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি ও বিদেশে ব্যাপক দাওয়াত ও আন্দোলন শুরু।	৪ বছর	বিরোধীদের ঐক্য জোট, চতুর্মুখী হামলার প্রয়াস ও বিদেশে মিথ্যা প্রচার।	গোটা আরবে দাওয়াতের প্রসার, মক্কা বিজয় ও বিদেশে মিশন প্রেরণ।

www.pathagar.com

পথে রাসূল (সা) এর বিপ্লবী কর্মধারা

হিজরতের পরে

(মদীনায় ১০ বছর)

৫	৬	
দাওয়াত ও আন্দোলনকে সামনে অগ্রসর করার উপযোগী অহি নাযিলের ধারা (সূরার নম্বর দেওয়া হলো)	ফলাফল	
	(ক) জনসাধারণের অবস্থা	(খ) কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিক্রিয়া
সূরা বাকারা থেকে সূরা মায়েদার পূর্ব পর্যন্ত।	ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ। চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি। (এ অবস্থা বদর যুদ্ধের পরে ঘটে।)	চতুর্মুখী হামলা, বদর থেকে আহযাব যুদ্ধ পর্যন্ত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। হুদাইবিয়ার সন্ধি।
সূরা মায়েদা থেকে আরম্ভ করে অবশিষ্ট মাদানী সূরাগুলি।	দলে দলে ইসলাম গ্রহণ, শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয়।	কায়েমী স্বার্থবাদীদের ঐক্য জোট, শেষ পর্যন্ত হতাশা ও আত্মসমর্পণ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদ

١ - فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا *

الفرقان - ٥٢

১। "অতএব হে নবী আপনি কষ্মিন কালেও কাফেরদের নীতি মেনে নিবেন না এবং এই কুরআনকে অবলম্বন করে তাদের সঙ্গে বড় রকমের জিহাদ করুন" ফুরকান ঃ ৫২

এখানে কুরআনকে অবলম্বন করার অর্থ হলো আল কুরআনের নীতিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কুফরী নীতি অবলম্বনকারীদের সঙ্গে জিহাদ করা। جِهَادًا كَبِيْرًا অর্থ হচ্ছে বড় ধরণের জিহাদ। অর্থাৎ জিহাদের ধরন যতই বড়হোক না কেন তোমরা পিছপা না হয়ে জিহাদে লিপ্ত হয়ে যাও।

٢ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - المائده ٣٥

২। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করো এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো তাহলে সম্ভাবনা আছে তোমরা সাফল্য লাভ করবে।" মায়েদাঃ ৩৫

এর থেকে বুঝা গেল আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তিনি তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমেই নৈকট্য লাভ। আমরা এ আয়াতের প্রথম অংশকে খুবই ভালো করে চিনি অথাৎ তিনি اِبْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ পর্যন্ত আর একই আয়াতের শেষ অংশটার কোনো উল্লেখই নাই সমাজে। এই হলো আমাদের অবস্থা।

٣ - اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * التوبة - ٤١

www.pathagar.com

৩। "তোমরা বেরিয়ে পড় হালকা হও বা ভারী হও [অর্থাৎ দল ছোট হোক বা বড় হোক এবং যুদ্ধাস্ত্র কম হোক বা বেশি হোক] জিহাদ করো তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায়। এইটাই তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা বুঝ!" তাওবা ঃ ৪১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেকে বলে থাকেন মাল সামান কম হোক বেশি হোক যা আছে তাই নিয়ে তাবলীগে বের হও। কিন্তু এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন একটি মুসলমানেরও মাথায় ৪০ দিনের তাবলীগী সফরের কোনো ধ্যান ধারণা বা চিন্তা-ভাবনা ছিল না। তখন ছিল তাবুক যুদ্ধের চিন্তাভাবনা যে যুদ্ধ ছিল রাসূল (সা)-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। যে যুদ্ধে মুনাফেকরা এই ভয়ে যোগদান করেনি যে এ যুদ্ধে যারা যাবে তাদের একটাকেও ফিরে আসতে হবে না। এই যুদ্ধ আল্লাহ মুসলমানদের মাল ও জান দুইটারই কুরবানী চেয়েছিলেন। এই যুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতির সময় রাসূল (সা) দান করতে বললে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর সমস্ত কিছুই দান করে দিয়েছিলেন এ আয়াত ঐ সময় নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছেঃ তোমাদের মাল সামান বা যুদ্ধের অস্ত্রসস্ত্র যা আছে তা কম হোক আর বেশি হোক আর লোক সংখ্যাও তোমাদের কমই হোক আর বেশিই হোক আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়। আল্লাহর এই কঠিনতম নির্দেশকে এখন সহজতর করে প্রচার করা হচ্ছে। যার অনিবার্য ফল স্বরূপ দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের ঈমানী চেতনা থেকে যুদ্ধ ও জিহাদের চেতনা ক্রমান্বয়ে বিদায় হচ্ছে। যা ইসলামী চিন্তা চেতনার মাথায় কুঠারাঘাতের সমতুল্য বলে আমি মনে করি।

٤ ـ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهٖ ـ التوبة ـ ٨٦

৪। "তোমরা তাঁর রাসূলের (সা) সাথে থেকে জিহাদ করো।" এটাও ঐ একই সূরার এবং একই প্রসঙ্গে নাযিল হওয়া আয়াতের অংশ।

٥ ـ وَجَاهِدُوْا فِىْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ـ الحج ٧٨

৫। "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো জিহাদের হক আদায় করে।" হজ্জঃ ৭৮

অর্থাৎ জিহাদ করো জীবন মরন পণ করে। নইলে দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে সমাজে কায়েম করতে পারবে না। এই কারণেই একই আয়াতে উপরিউক্ত কথার পরপরই বলা হয়েছে - "هُوَ اجْتَبٰكُمْ এ

www.pathagar.com

কাজের জন্য তিনিই তোমাদেরকে বাছাই করেছেন। অর্থাৎ যারা জিহাদ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে তাদেরকে যেমন দুনিয়ায় বাছাই করেছেন জিহাদের জন্য তেমন পরকালে বাছাই করবেন বেহেশ্‌ত দেয়ার জন্য।

٦ - وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط - الصف - ١١

৬। "এবং তোমরা মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো।" আস-সফঃ১১। (এর ব্যাখ্যা পূর্বে দেয়া হয়েছে।)

٧- فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاط وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا - النساء - ٨٤

৭। "অতএব হে নবী তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো। তুমি তোমার নিজের জন্য ছাড়া অন্য কারো জন্য দায়ী নও। অবশ্য ঈমানদার লোকদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাক। সম্ভাবনা আছে আল্লাহ শীঘ্রই কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দিবেন কেননা আল্লাহর শাস্তিই সর্বাপেক্ষা বড় শাস্তি এবং তাঁর দেয়া শাস্তিই সর্বাপেক্ষা কঠোর।" আন নিসা ঃ ৮৪

যেখানেই আল্লাহর নিজের বেলায় সম্ভাবনার কথা বলেছেন তার প্রত্যেক স্থানেই সম্ভাবনার অর্থ 'নিশ্চিতই'- কারন মানুষের বেলায় সম্ভাবনা বলা হয় সেইরূপ স্থানে যেখানে মানুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রশ্ন রয়েছে অর্থাৎ যদি ক্ষমতায় কুলায় তাহলে হয়ত হতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহর যেহেতু কোনো কিছুর ঘাটতি নেই। সুতরাং তিনি যখন তাঁর নিজের ব্যাপারে সম্ভাবনা বলেন সেখানে একটি শর্ত থাকে তা হচ্ছে আল্লাহ যে কাজ করতে বলতেছেন তা যদি করা হয় তবে আল্লাহর 'সম্ভাবনা' আর সম্ভাবনা থাকে না, ওটা নিশ্চিতই হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ যা করতে চেয়েছেন তা অবশ্যই করবেন যেমন এখানে বলা হয়েছে সম্ভাবনা আছে আল্লাহ কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দিবেন। আল্লাহ তা নিশ্চিতই দিয়েছেন।

٨ - وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ - البقرة - ١٩٠

৮। "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" বাকরাঃ ১৯০

অর্থাৎ মুসলমানদের ইসলামী কার্যকলাপ নিয়ম নীতি আইন-কানুন

www.pathagar.com

যারা সহ্য করতে না পেরে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে তখন চুপ-চাপ বসে মার খেয়োনা, তুমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। যেন তোমরা তোমাদের ইসলামী নীতিকে বহাল রাখতে পার। কিন্তু এই যুদ্ধ করতে গিয়ে যেন সীমালংঘন না হয়ে যায় সে জন্য একই আয়াতে আল্লাহ বললেন–

وَلَاتَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۔

এ ব্যাপারে তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘন কারীদের পছন্দ করেন না।

٩ ۔ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔ البقرة ۔ ٢٤٤

৯। "এবং তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো আর খুব ভালো করেই জেনে রাখ যে আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং জানেন।"

١٠ ۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْآ اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا * النساء ٧٦

১০। "যারা ঈমানের নীতি গ্রহণ করেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায় আর যারা শয়তানের নীতি গ্রহণ করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের রাস্তায়। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল।"

তাগুত বলা হয় তাদেরকে যারা আল্লাহর আইন বাতিল করে নিজেদের আইন সমাজে চালু করে। আর এমন আইন তৈরি করে যে আইন মানতে হলে আল্লাহর আইনকে অমান্য করেই তা মানতে হয়। অর্থাৎ তারা আইন করে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে। এরাই হচ্ছে তাগুত। আর যতক্ষণ না এই তাগুতদের পরাস্ত করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের আইন পুরোপুরি কোনো দেশে চালু করা সম্ভব নয় যেমন আলো এবং অন্ধকার একই সাথে একস্থানে অবস্থান করতে পারে না ঠিক তেমনই তাগুতি আইন কানুন আর ইসলামি আইন-কানুন একই সাথে চলতে পারে না। আলো জ্বালার অর্থই যেমন অন্ধকার দূর করা তেমন ইসলাম কায়েমের অর্থই হলো তাগুতি শক্তিকে পরাভূত করা। এ কারণেই আল্লাহ হুকুম

www.pathagar.com

করেছেন –

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج النحل ـ ٣٦

"তাগুতের দাসত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর দাসত্ব করো।"

অর্থাৎ তাগুতের আইন মেনে চলো না, আল্লাহর আইন মেনে চলো।

এ কারণেই তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম করেছেন আল্লাহ।

١١ ـ وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ لا اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ✽ التوبة ـ ١٢

১১। "আর যদি প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে তাহলে কুফরের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কেননা তাদের কসমের কোনো বিশ্বাস নেই। সম্ভবতঃ (তরবারির আঘাতেই) তারা বিরত হবে।" তাওবা ঃ ১২

١٢ ـ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ التوبة ـ ٢٩

১২। "যুদ্ধ করো আহলি কিতাবের সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না (অথচ তারা আহলি কিতাব) আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা তারা হারাম করে না এবং দ্বীন ইসলামের আইন কানুন ও বিধি বিধানকে নিজেদের জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে না (তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক) যতক্ষণ না তারা নিজ হাতে জিযিয়া (কর) দিতে সম্মত হয় এবং অধীন হয়ে থাকতে স্বীকার করে।" তাওবাঃ ২৯

এখানে বুঝা গেল যে যুদ্ধ করার হুকুম বিধর্মী হলেই তার বিরুদ্ধে নয়। এ হুকুম আহলে কিতাব হলেও তারা যদি জীবন ব্যবস্থাকে নিজেদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মেনে না নেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে সব কাজ হারাম করেছেন তা যদি তাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম জারী করা হলো এ আয়াতের মাধ্যমে। তবে তারা যদি অধীন হয়ে থাকতে স্বীকার করে তবে আর তাদের সাথে কোনো যুদ্ধ নেই। হাঁ তবে এ আয়াতে যে জিযিয়া করের কথা রয়েছে তা

www.pathagar.com

হচ্ছে এই জন্য যে যারাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের ওপর দেয়া যাবে না বা দিলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে তাদেরকে জিযিয়া কর দিতে হবে। এর পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান মালের হেফাজত করবে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রের হেফাজতের দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হবে না বরং রাষ্ট্রই তাদের জান মাল ও মান ইজ্জতের হেফাজত করবে।

١٣ ـ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ * التوبه ـ ٣٦

১৩। "আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো সকলে এক সঙ্গে মিলে যেমন ওরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে সবাই একদলবদ্ধ হয়ে। আর জেনে রাখ আল্লাহ্ মুত্তাকীনদের সংগেই রয়েছেন। তাওবা ঃ ৩৬

এ আয়াত থেকে জানা গেল মুশরিকরা যখন মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন তারা একজোট হয়ে যায়, তাই আল্লাহর হুকুম হলো- তোমরা নিজেরা যত দলাদলিই করো না কেন যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তখন সব এক দলবদ্ধ হয়ে যাও।

আমরা নামাযের ব্যাপারে যে শিক্ষা পেয়েছি যুদ্ধ ও জিহাদের ব্যাপারেও সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ নামাযের জন্য মসজিদের জামাতের জন্য একামত দেয়া হয় তখন সব দলের ও সব গ্রুপের মুসলমান হুড় মুড় করে গিয়ে একই ইমামের পিছনে জামায়াতে শামিল হয়ে নামায আদায় করি। ঠিক তেমনই যুদ্ধের জন্য ডাক এসে গেলে একই সঙ্গে এক দলবদ্ধ হয়ে একই নেতার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে হবে।

٢٤ـ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ *
التوبة ١٢٣

১৪। "ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা যুদ্ধ করো সেই সব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে। আর তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায় (তারা তোমাদের নরম দেখলে তাদের মনোবল বেড়ে যাবে)। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মুত্তাকীনদের সঙ্গে রয়েছেন।" তাওবা ঃ ১২৩

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল কিছু দ্বীনের শত্রু ঈমানদারদের খুব নিকটেই রয়েছে। যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকে অমুসলিম হতে হবে এটা কোনো শর্ত নয়। তাদের কার্যকলাপ, চলার নীতি ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হবে যে আসল সত্যকে মেনে নিয়েছে কি-না।

١٥۔ فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ج الحجرات ۔ ٩

১৫। "সীমা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি ফিরে আসে।" হুজুরাতঃ ৯

এর পুরা আয়াতের ভাবার্থ হলো কখনও কোনো দুই ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে বা কোনো মু'মিনদের দু'টো দলের মধ্যে যদি লড়াই লেগে যায় তাহলে অপর ঈমানদারদের উচিৎ হবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। যদি এতে কোনো পক্ষ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মীমাংসায় রাজি না হয় তবে যারাই বাড়াবাড়ি করবে তাদের বিরুদ্ধে তোমরাও যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা বাড়াবাড়ি ত্যাগ করে মীমাংসায় রাজি হয়। অতঃপর যখনই তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসবে তখন দুই পক্ষের কথা শুনে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও যেন ন্যায় বিচার হয়।

١٦ ۔ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَاعُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ * البقره ۔ ١٩٣

১৬। "তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্তভাবে দূর হয় এবং দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়। এর পর যদি তারা বিরত হয় তবে (তাদের সঙ্গে আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই) একমাত্র জালেমদের উপর ছাড়া আর কারো উপর হাত উঠায়ো না।" বাকারা ঃ ১৯৩

অর্থাৎ যারা জালেম নয় এবং যাদের দ্বারা সমাজে ইসলাম বিরোধী কোনো ফেতনা সৃষ্টি না হয় তাদের সঙ্গে তোমাদের কোনই দ্বন্দ্ব নেই।

١٧ ۔ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَقَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۔ التوبة ۔ ١٤

১৭। "তাদের সাথে লড়াই করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন। আর তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, তাদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং এভাবে মু'মিনদের দিলকে তিনি ঠান্ডা করবেন।" তাওবাঃ ১৪

١٨ ـ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ الانفال ـ ٣٩

১৮। "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্ত ভাবে দূর হয় এবং দ্বীন ইসলাম বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট হয়। এরপর যদি তারা ফেতনা হতে বিরত হয় তবে তাদের আমল আল্লাহ দেখবেন।" আনফালঃ ৩৯

١٩ ـ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ * التوبة ـ ٧٣

১৯। "হে নবী তুমি কাফের ও মুনাফিকদের সঙ্গে পূর্ণ শক্তি দিয়ে জিহাদ করো, তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম; তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।" তাওবা ঃ ৭৩

٢٠ ـ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ التحريم ـ ٩

২০। এই দুই সূরার দুই আয়াতের ভাষা একই, অর্থও এক।

এই ২০টি আয়াতে যুদ্ধ ও জিহাদ সম্পর্কে রয়েছে প্রত্যক্ষ নির্দেশ আর বাকি ৬৫ টি আয়াতে রয়েছে পরোক্ষ নির্দেশ সে আয়াতগুলোর সূরা ও আয়াত নম্বর নিম্নে দেয়া হলো।

এর কোনো কোনো আয়াতে ২ বা ৩ বারও উল্লেখ রয়েছে, জিহাদ বা যুদ্ধ সম্পর্কে। তাই যে আয়াতে যতবার আছে সে আয়াত ততবার দেয়া হলো। অনুগ্রহ পূর্বক কুরআন মজীদ থেকে দেখে নিন।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লাহ মাত্র একবার হুকুম করলেই তা ফরয হয়ে যায় কিন্তু যে ফরযের পর আল্লাহ বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সে ফরয সম্পর্কে বার বার নির্দেশ করেছেন। আমি শুধু যুদ্ধ ও জিহাদের ফরজিয়াতটা তুলে ধরার জন্য প্রত্যেক নির্দেশ সূচক আয়াতগুলো এর সাথ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

অন্যান্য ৬৫টি আয়াত

সূরা বাকারা ১৯০, ১৯১, ১৯১, ১৯১, ১৯২, ২২৭, ২২৮, ২৪৬, ২৪৬, আলে ইমরান ১৩, ১১১, ১৪৬, ১৬৭, ১৯৫ সূরা নিসা ৭৪, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৬, ৯০,৯০,৯০, ৯৫, ৯৫, ৯৫ ১৪২, সূরা মায়েদা ৫৪ সূরা আন্‌ফাল ৭২, ৭৪, ৭৫, সূরা তাওবা ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২৪, ২৬, ৩০, ৪৪, ৭৩, ৮১, ৮৩, ৮৮, ১১১, সূরা নাহল ১১০, সূরা হজ্জ ৭৮, সূরা ফোরকান ৫২, সূরা আনকাবুত ৬, ৮, ৬৯, সূরা লোকমান ১৫, সূরা আল আহজাব ২০, সূরা মোহাম্মদ ৩১, সূরা আল ফাতাহ ১৬, ২২, সূরা আল হুজারাত ৪৯, সূরা আল হাদীদ ১০, ১০, ১০, সূরা হাশর ১৪, সূরা মুমতাহিনা, ১, ৮, ৯, সূরা আস্‌-সাফ্‌ ৪, সূরা মুনাফিকূন ৪, সূরা জ্বিন ২০।

এখানে মোট ৫৫টি আয়াতের মধ্যে ৬৫ স্থানে যুদ্ধ ও জিহাদ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে নির্দেশ রয়েছে। পূর্বে দেখান হয়েছে ২০টি প্রত্যক্ষ নির্দেশ। সব মিলে ২০+৬৫=৮৫টি নির্দেশ।

আশা করি এ দীর্ঘ আলোচনায় আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, নামায রোযা হজ্জ্ব যাকাতের মত জিহাদও মু'মিনের জন্য ফরয। জিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের ঈমানদারের ঈমানের পরীক্ষা হয়। আর জিহাদের বিপদ সংকুল পথ ধরেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূল (সা) এর ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগীর প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালে আমরা দেখতে পাই আল কুরআনের নির্দেশের আলোকে তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। উম্মতের জন্য এ ধারাই আদর্শ ধারা। এ যুগেও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঐ আদর্শই অনুসরণ করতে হবে।

আসুন আমরা আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলের কর্মসূচীকে সামনে রেখে অগ্রসর হই এবং আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিবেদিত হই।

ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

খন্দকার প্রকাশনী

বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০